এম ফর মার্ডার

জেমস হেডলি চেজ

BENGALIEBOOK.COM
★2022★

সূচিপত্র

সোনালী রং-এর ঢেউগুলো....2
যুদ্ধ জাহাজের মতই রোলস রয়স গাড়ি....41
সারারাত এপাশ-ওপাশ....85
দড়াম দড়াম করে হাতুড়ি 119

সোনালী রং-এর ঢেউগুলো

সোনালী রং-এর ঢেউগুলো সমুদ্রতীরে আছড়ে পড়ছে। দূর পাহাড়ের গা বেয়ে যে সাদা সরু রাস্তাটা চলে গেছে, সেদিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল শেড। সে সমুদ্রতীরের একটা কুঁড়ে ঘরে জানলার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল।

ভাবছিল ঐ পথ ধরেই আড়াই ঘণ্টা পরে ল্যারী আসবে। যদি এখনই সে টেপ করতে শুরু করে তাহলে তা শেষ হতে মাত্র দু ঘণ্টা সময় লাগবে। বাকী থাকবে আধঘণ্টা।

সে একটা চেয়ারে এসে বসল। ঘরটা বেশ গরম, যদিও পাখা চলছে। সামনে একটা টেবিলের উপর একটা টেপ রেকর্ডার রয়েছে, আর পাশেই রয়েছে এক বোতল মদ।

বোতল থেকে সে অনেকখানি মদ গলাধঃকরণ করে নিল। তারপর উঠে দাঁড়াল। ডান হাত দিয়ে মাথার মধ্যে সে বিলি কাটল।

শেড বেশ বলিষ্ঠ যুবক। ওর চোখ দুটো নীল–সমুদ্রের মত। গেঞ্জী পরে বসে আছে। তাকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। চেহারাতে বেশ সুপুরুষও বটে। অনিচ্ছাসহকারে সে ঘরের কোণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

ডিভানটার উপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে মেয়েটা। তার মুখটা ভাল করে দেখা যাচ্ছিল না। মেয়েটার মুখ আর কাঁধের অংশ ডিভানের ও পাশে ঝুলে পড়েছিল। মুখখানার কথা

ভাবতে গিয়ে শিহরণ জাগল–মুখখানা কালো হয়ে গেছে, চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে।মুখ থেকে জিভটা লম্বা হয়ে ঝুলে পড়েছে।

জোর করে সেদিক থেকে দৃষ্টি ফেরালশেড। গাড়ী থেকে নিয়ে আসা ভারী রেঞ্জটা টেবিলের উপর আওতার মধ্যে রাখল সে। একটা সিগারেট ধরাল। ভাবল, এবার তার স্বীকারোক্তি টেপ করা দরকার। ল্যারী আসার আধঘণ্টা আগেই তার রেকর্ড শেষ করা হয়ে যাবে।

কিন্তু সে যতবার রেকর্ড শুরু করতে যায়, ততবারই মেয়েটির বীভৎস মুখ তার সামনে ভেসে ওঠে। নিজেকে গালাগালি দেয়।

তোমার সামনে বিপদ, সে বিপদ থেকে কিভাবে উদ্ধার পাবে তা ভেবেই কাজ করো। যে মারা গেছে, তার চিন্তা করে বিপদ বাড়িয়ো না।

মনে সাহস এনে শেড টেপটা চালিয়ে দিল, ধীর শান্ত গলায় বলল–ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নী মিঃ জন হ্যারিন্টনের অবগতির জন্য এই স্বীকারোক্তি টেপ করছি।

আমি শেড উইন্টার্স, ক্যালিফোর্নিয়ার ক্লিক সাইডের বাসিন্দা, বেলা দুটো পঁয়তাল্লিশ মিনিটে এই বয়ানটি টেপ করছি। আজ ত্রিশে সেপ্টেম্বর।

আমি একটা খুনের ঘটনার বয়ান দিতে যাচ্ছি। কিন্তু তাতে আপনি স্পষ্টভাবে ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন না। তাই ঘটনাটি কিভাবে ঘটল, কেনই বা ঘটল, এটা কেনই বা খুনে পরিণত হল, আর কেনই বা লেফটেন্যান্ট লোগো সব জেনেও আমাকে গ্রেপ্তার করলেন

না–সবই আমি পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে বলছি। ধীরে সুস্থে মন দিয়ে আমার কথা শুনুন, তাহলে স্পষ্ট হয়ে সব কথা আপনার কাছে ধরা দেবে।

একটু থেমে সে আবার বলতে শুরু করল

.

০১.

প্যাসিফিক ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের স্টক ও সিকিউরিটি বিভাগের একজন ক্লার্ক আমি।

অফিসে বসে ব্যবসাপত্র সংক্রান্ত কতকগুলো কথা আমি চিন্তা করছি, সেই সময় ইন্টারকমে ডাক পড়ল।

সংযত স্বরে জবাব দিলাম আমি উইন্টার্স বলছি।

ওপার থেকে জবাব এল–ওঃ মিঃ উইন্টার্স!দয়া করে একবার মিস্টার্নডের ঘরে আসবেন! বিশেষ দরকার।

আমি তখন সবেমাত্র লিনস্টেনের কাছ থেকে ধার নেব বলে ফোন করতে যাচ্ছিলাম। সে একজন অর্থপিশাচ। চড়া সুদে টাকা ধার দেয়। আসলে আমার এখন টাকার খুব দরকার।

আজ সকালবেলা পাঁচটা চিঠি পেয়েছি, চারটি ব্যবসাদারদের কাছ থেকে আর,একটা মেয়েটার কাছ থেকে।

মেয়েটা আমারই জন্য অন্তঃসত্ত্বা। আমি আমার দায় পালন করব কিনা তা জানতে চেয়ে সে চিঠি লিখেছে। মেয়েটির মুখ বুজিয়ে রাখাটা আমার কাছে কোন ব্যাপার নয় কিন্তু ঐ ব্যবসাদাররা আমাকে শাসিয়েছে যে, তাদের ঋণ শোধ করতে না পারলে আমাকে নাকি দেখে নেবে! আমার বসূকে জানাবে, এরকম আরো কত ধরনের কথা লিখে আমাকে শাসিয়েছে।

জানি, ওদের সময়মত টাকা দিতে না পারলে নেকড়ে বাঘের মত ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। যেমন করেই হোক টাকার জোগাড় করতে হবে। আর ওদিকে মিঃ স্টার্নউডের তলব। যেখানে বাঘের

মিঃ স্টার্নউড খুব কঠিন লোক। অফিসের কাজ তো কিছুই করি না। বরং সুন্দরী টাইপিস্ট আর রিসেপশনিস্টদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াই। আমার কাজের ব্যাপারে কেউ তার কাছে রিপোর্ট দিল, না কি কোন পাওনাদার তার কাছে অভিযোগ করেছে।

সাত পাঁচ চিন্তা করতে করতে আমি স্টার্নউডের ঘরের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালাম। সার বাঁধা টেবিলের পাশ দিয়ে যাবার সময় কলিগদের চাপা হাসি শুনতে পেলাম। তারা আমাকে দেখে বেশ হিংসে করে তা আমি বুঝতে পারি।

আমি লোকগুলোকে অবশ্য করুণা করি। তাদের আমি জন্তু বলে মনে করি। তাদের কাজে যাওয়া, অফিসে কেরানীগিরি করা,আর বাড়ি ফিরে বউদের পেটিকোটের নীচে

কুকুরের বাচ্চাদের মত কুন্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকবার জন্য কেবল ছটফটানি। যাদের এখনো বউ হয়নি, তাদের কেবল দিনরাত বউয়ের খোঁজ।

যাক আমি স্টার্নউডের দরজা নক করে তার ঘরে ঢোকবার জন্য অনুমতি চাইলাম।

মিঃ স্টার্নউড আমাকে বসতে বললেন। হাতের কাগজপত্তরগুলো দেখতে দেখতে তিনি বলেন–আচ্ছা শেড তোমার বয়স কত হল?

–আজ্ঞে বত্রিশ।

দ্যাখো, তুমি আর লিডবেটার একই সঙ্গে এই ব্যাঙ্কে এসেছ। সে আজ অ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজার, আর তুমি? কোন উন্নতি হল না। কেন বলতে পার?

চটপট জবাব দিলাম–লিডবেটার আমার থেকে অনেক বেশী বুদ্ধিমান।

স্টার্নউড বলে চলেন–না, তোমার কথাটা ঠিক নয়, আসল কথা সে নিষ্ঠাভরে কাজ করে আর তুমি তা তো করই না, বরং তোমার নিজস্ব কাজের কোন খোঁজ রাখনা। তোমার করণীয় কাজটা তুমিকরনা। এভাবে কোন্ ব্যাঙ্কের কাজ কতদিন চলতে পারে?তুমি জান তোমার জায়গায় অন্য কেউ হলে কবে তাকে বরখাস্ত করতাম। কিন্তু তুমি আমার বন্ধুর ছেলে বলে তোমার এই গাফিলতি এতদিন ধরে সহ্য করছি। মিঃ স্টার্নউড একটু থামলেন, একটা সিগারেট ধরালেন।

মিঃ স্টার্নউড আমার বাবার বন্ধু। তার আগ্রহে এই চাকরীতে আমি যোগ দিই। এক যোগ্য ব্যাঙ্কার হয়ে ওঠার জন্য তিনি সর্বদা আমাকে উৎসাহ দিতেন। এখন তিনি আমার উপর বেশ হতাশ হয়েছেন। এখানে কাজ করবার আগে আমি সৈন্যবাহিনীতে পাঁচ বছর কাটিয়েছিলাম।

আমার চাকরী চলে যাবার ভয়ে থেমে গেলাম।

তোমার মতলবটা কি বলতে শেড? তুমি কি আমাদের ব্যাঙ্কে আর থাকতে চাইছনা? স্টার্নউড জিজ্ঞাসা করল।

তার গলার স্বরে হতাশার ছাপ। মনে হল আমি যেন খুব অন্যায় করে ফেলেছি। সঙ্গে সঙ্গে বললাম না স্যার। আমি ছাড়বার কথা ভাবি নি। আমি খুব অন্যায় করে ফেলেছি। এবার থেকে আমি মন দিয়ে কাজ করব। আমাকে আর একবার সুযোগ দিন।

স্টার্নউড বললেন–ঠিক আছে, আর একবার তোমাকে চান্স দিচ্ছি। তোমাকে এবার যে কাজটা দেব, তা অন্যরকম, তবে বেশ কঠিন। যদি ঠিকভাবে করতে না পারো, ব্যাঙ্কের ভীষণ ক্ষতি হবে। কাজটাও হাতছাড়া হয়ে যাবে, তুমিও ছাঁটাই হয়ে যাবে। এখন থেকে তুমি এই কাজের জন্য দেড়শ ডলার বেশী পাবে। লিডবেটার তোমাকে কাজটা বুঝিয়ে দেবে।

কাজটা যে কত শক্ত, তা যখন বুঝতে পারলাম ভয়ে হাত–পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। লিডবেটারের মত দক্ষ কর্মীর মাথার চুল পেকে গেছে ছমাসের মধ্যে, আর সেই কাজের দায়িত্ব আমার উপর পড়ল!

মিঃ স্টার্ডড আমাকে জোশশেলী সম্পর্কে কিছু তথ্য দিলেন। তিনি শহরের একজন বিশাল প্রভাবশালী ব্যক্তি। একদিকে তার ট্রাকটরের ব্যবসা অপরদিকে ট্রাঙ্ক তৈরীর ব্যবসা করে কোটি কোটি ডলার রোজগার করেন। উনিশশ সাতচল্লিশ সালে তিনি মারা যান। তার মেয়ের নামেনগদ সাত কোটি ডলার রেখে যান আর সম্পত্তি তো রয়েছেই।

উইলে নির্দেশ দেওয়া ছিল যে, জমিদারী এবং তার অগাধ বিষয় আশয় সবই প্যাসিফিক ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন দেখাশোনা করবে।

অবশ্য তার মেয়ে যদি আমাদের কাজে অসন্তুষ্ট হয় তবে অন্য ব্যাঙ্কে তাদের অ্যাকাউন্ট স্থানান্তরিত করতে পারবে। এতবড় সম্পত্তির দেখাশোনাকরতে অনেক ব্যাঙ্কইরাজি থাকবে কেননা শেলীর অ্যাকাউন্টের টাকা খাটিয়ে অনেক পরিমাণ ডলার সহজে লাভ করা যায়।

জোশ শেলীর কন্যা ভেস্তাল একেবারে গভীর জলের মাছ। এতদিন বাপের শাসনে সে ঘরের মধ্যে জন্তুর মতই আটকে ছিল, আর বাবা মারা যাবার পর বিশাল সম্পত্তি হাতে পেয়ে একটা রক্তলোভী বুনো দাতাল শুয়োর হয়ে উঠেছে।

নিষ্ঠুর প্রকৃতি ও নীচু মনের মেয়ে এই ভেস্তালের মেজাজও বেশ সাংঘাতিক।

গত ছ বছর ধরে ব্যাঙ্কের পনের জন দক্ষ কর্মচারী শেলীর অ্যাকাউন্টের কাজ করে কেবল বদনামই কুড়িয়েছে। কাউকে শান্তিতে কাজ করতে দেয়নি ভেস্তাল।

শেলীর অ্যাকাউন্টেন্টের কাজ করা মানে স্বেচ্ছায় ফাসীর দড়ি গলায় পরা।

লিডবেটার তার কাজের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে লাফিয়ে উঠল আনন্দে।

শেলী অ্যাকাউন্টের ঘরে এসে আমাকে ফাইল খুলে কাগজপত্র দেখাতে লাগল। আমি তার ব্যস্ততা দেখে তাকে থামিয়ে দিযেবললাম তুমি এসববন্ধকর, এসব জটিলব্যাপার আমার মাথায় ঢুকবে না।

আমি যেন মাতৃহত্যা করে ফেলেছি এমনভাবে লিডবেটার আমার দিকে তাকাল। সে বলল–শেড, তুমি জান না ভেস্তাল কেমন সাংঘাতিক মেয়ে। কেউ সুখে থাকুক, মেয়েটা তা চায় না। কাজে সামান্য খুত হলে, কৈফিয়ৎ চাইবে। আর সে তোমাকে ছিঁড়ে খাবে।

কর্মদক্ষতা না দেখাতে পারলে এই অ্যাকাউন্ট হাতছাড়া হয়ে যাবে। ব্যাঙ্ক তো তোমাকে খাবেই আর মিস শেলীও তোমাকে মরণ কামড় দেবে।

সে সাবধান করে বলল–শেড, তোমার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। সাবধান। তোমার উপর ভীষণ দায়িত্ব, এই ফাইলগুলো ভাল করে বোঝবার চেষ্টা কর।

আমি হাসলাম। তাচ্ছিল্যের সুরে বললাম–শোন, লিডবেটার মেয়েদের কিভাবে হ্যাঁন্ডেল করতে হয় তা আমার জানা আছে। আর ঐ হিংস্র মেয়েটি এবার বুঝবে, কার সঙ্গে হেঁচড়ামো করছে। তোমাকে এসব নিয়ে ভাবতে হবে না।

.

০২.

পনেরই মে। আজ সকালবেলা মিস শেলীর সঙ্গে দেখা করবার অভিপ্রায়ে তার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

তার সম্পর্কে লিডবেটারের কাছ থেকে যা যা জেনেছিলাম, সেই তিনটি বিষয় দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়া যাবে বলেই আমার মনে হল। ভেস্তালের এই তিনটি দাবী হল

এক–পঁচিশ হাজার ডলার দিয়ে যে ফারের কোটটা তিনি সম্প্রতি কিনেছেন, সেটা ইনকামট্যাক্সের খাতায় গোপন করতে হবে, ন্যায্য খরচের হিসাব দেখাতে হবে।

লিডবেটার তা অবাস্তব বলে নাকচ করেছে। তা না হলে ব্যাঙ্কের বিপদ হবে।

দুই–লোরার ইস্টসাইডে মাইল দুই জুড়ে শেলী ফাউন্ডেশনের যে বিশাল ভাড়া বাড়ী আছে তাতে শতকরা পনের ভাগ ভাড়া বাড়াতে হবে।

তিন–উনিশশো চোদ্দ সালে তার বাবা তিনশ চৌত্রিশ নং ওয়েস্টার্ন অ্যাভিনিউ–এর বিরাট ফ্ল্যাট বাড়িটা কিনেছিলেন তা ব্যাঙ্ককে বিক্রী করে দিতে হবে মিঃ বার্জেসের কাছে। তিনি সেখানে একটা পতিতালয় খুলতে চান।

এই তিনটি প্রস্তাব মানা সম্ভবপর নয়। তাছাড়া দ্বিতীয় দাবীটির প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, ঐ বাড়িটির ভাড়া কিছুদিন আগেই বাড়ান হয়েছে। আর তিননম্বরের বাড়িটা বিক্রী করা

ব্যাঙ্কের পক্ষে সম্ভবনয়, কারণ ঐ বাড়িটাতে তার বাবার আমলের ভাড়াটেরা রয়েছে। আমি বুঝতে পেরেছিলাম ঐ তিনটি বিষয়ে আমাকে তৈরী থাকতে হবে।

আমি দশটার সময় একটা ট্যাক্সিতে চড়ে শেলী হাউসে হাজির হলাম। আমার পরনে তখন ছিল লিনেনের স্পোর্টস জ্যাকেট বড় বড় পকেটওয়ালা। ডীপ নীল রং এর ঢোলা গ্যাবার্ডিনের প্যান্ট, সাদা শার্ট আর কাক লেদারের জুতো। রুমালটা বেশ জংলী টাইপের ছিল।

শেলী হাউসের প্রাইভেট রাস্তা, পাহাড় কেটে তৈরী। অনেকগুলো বাঁক ঘুরে তিন মাইল রাস্তা নশো ফুট ওপরে বিশাল গেটের সামনে পর্যন্ত চলে গেছে। এটা বাড়ি তো নয়, প্রাসাদ বললে ভুল হয় না।

গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করতে থাকি আমি, এমন সময় ধর্মযাজকের মত চেহারার একজন লোক দরজা খুলে উদয় হল।

বললাম–মিঃ উইন্টার্স! মিস শেলীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

সে আমাকে ভেতরে নিয়ে গেল। পেনসিলভানিয়া সেন্ট্রাল স্টেশনের মতন একটা বিরাট হলঘরে এসে দাঁড়ালাম। বসতে বলে লোকটা চলে গেল। আমি ঘুরে ঘুরে চারিদিক দেখতে লাগলাম।

কত রকমের যুদ্ধাস্ত্রবর্শা, তরোয়াল, বল্লম, কুঠার, অয়েল পেন্টিং ছবি ঘরে ভর্তি। ছুটন্ত ঘোড়ার ছবিই বেশী।

বাড়ির এমন গমগমে পরিবেশে লিডবেটারের গোবেচারা মুখটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। আমার বেশ ভয় করতে লাগল।

কয়েক মিনিট পরে চাকরটা এসে বলল–আমার সঙ্গে আসুন।

চাকরটার সঙ্গে আমি বিশাল বারান্দা পেরিয়ে ওক কাঠের দরজার সামনে এলাম। চাকরটা ঐ দরজার এক পাল্লা খুলে ভিতরে কারোর উদ্দেশ্যে বলল–প্যাসিফিক ব্যাঙ্কের মিঃ উইন্টার্স।

বুকের ভিতরে কাঁপুনি নিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকলাম। ঘরটা ছোট হলেও বেশ ভোলামেলা। ও পাশের জানালা দিয়ে বাগান আর সমুদ্রের মনোরম দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। ঘরের মধ্যে ফুলদানী ভর্তি। জানলার পাশে একটা ডেস্ক আর তাতে আসীন একটা মেয়ে। তার মাথা ভর্তি কালো চুল। রিমলেস চশমার ফাঁক দিয়ে তার কৌতূহলী চোখদুটো আমাকে তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করছে।

কয়েকমাস পরে এই মেয়েটিই আমাকে নরকে নামিয়েছিল। তখনই আমার মেয়েটিকে ভাল করে দেখা উচিত ছিল।

আপনিই মিঃ উইন্টার্স? সে প্রশ্ন করল।

–আজ্ঞে হ্যাঁ।

সে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল–আমি মিস ডোলান, মিস শেলীর সেক্রেটারী।

আমাকে তার অনুরোধে বসতে হল। সে জানাল, মিস শেলীর কিছুক্ষণ দেরী হতে পারে। তখনই আমার মনে পড়ে গেল লিডবেটারকেও এরকম ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হত, ফিরেও আসতে হত।

আমি ডোলানের উদ্দেশ্যে বললাম–আমি বাগানে আছি। উনি যখন আসবেন, আমাকে দয়া করে ডেকে নেবেন।

বাগানে এসে সিগারেট ধরালাম। পনের মিনিটে তিনখানা সিগারেট শেষ হল। তবুও ডাক পড়ল না।

মিস ডোলানের ঘরে এসে বললাম–উনি কি তৈরী হন নি?

বোধ হয় আরও একটু অপেক্ষা করতে হবে আপনাকে।

মিস ডোলানের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি তার কাছে একটা কাগজ আর খাম চাইলাম। সেটা দিতেই আমি তার উদ্দেশ্যে বললাম–টাইপরাইটারটা একটু ব্যবহার করছি,বলেই বসে পড়ে একটা চিঠি টাইপ করলাম। প্রিয় মিস শেলী,

পনের মিনিট ধরে আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করছি। মিস ডোলানের কাছ থেকে জানতে পারলাম–আপনার আরও দেরী হতে পারে। কিন্তু আমার তো একটা বিবেক আছে। এখানে বসে থাকলে আমার সময় নষ্ট হবে, আর তাতে আপনারই অর্থের ক্ষতি।

জানেন তো বিনিয়োগকারী ঘুমিয়ে থাকলেও শেয়ার মার্কেট অপেক্ষা করেনা। তাছাড়া ফার কোটের ব্যাপারটা আপনার স্বার্থেই আলোচনা করা দরকার।

নিজের নাম সই করে চিঠি খামে ভরে একটা চাকরের হাত দিয়ে মিস শেলীর কাছে পাঠালাম।

তারপর জানলার কাছে এসে একটা সিগারেট ধরালাম। বেশ ভয় লাগছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই চাকরটি এসে জানাল–মিস শেলী এখনই আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। স্যার, আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

মিস ডোলানের বিস্ময় ভরা মুখটা আমার চোখে পড়ল। তার চোখে বিস্ময়ের ছাপ কিছুটা প্রশংসারও বটে। আমি তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরোলাম।

চাকরটিকে অনুসরণ করে ভেস্তাল শেলীর ঘরে পৌঁছলাম। বিশাল বিছানার উপর আধশোয়া ভঙ্গিতে যাকে দেখলাম, তাকে বাড়ির চাকরের পর্যায়ে ফেললে বোধহয় ভালই হবে।

হাড়গুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কপালের নীচে দুটো কালো গর্তের মধ্যে থেকে চোখ দুটো যেন ঠিকরে বার হয়ে আসতে চাইছে। একমাথা শুকনো হলুদ রং–এর চুল। বাজপাখীর ঠোঁটের মত খাড়া নাক। লাল লিপস্টিক সত্ত্বেও ঠোঁটটা যেন ঢাকা পড়ে গেছে।

পরস্পরের চোখাচোখি হওয়াতে সে হেসে মৃদু সম্ভাষণ জানাল–আপনিই শেড উইন্টার্স? গলার স্বরটা মৃদু ও সুরেলা, যা চেহারার সঙ্গে বেমানান।

–হ্যাঁ, মিঃ স্টার্নউড আমাকে...।

আমার কথা শোনবার দিকে তার কান নেই, মাঝপথে আমাকে থামিয়ে প্রশ্ন করল–এটা আপনি লিখেছেন? চিঠিটা দেখাল।

আজ্ঞে, হ্যাঁ। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকাতে আমার বেশ অস্বস্তি হচ্ছে, ঐরকম অবস্থায় মিস শেলী বলে–আপনি বেশ সুন্দর দেখতে, মিঃ উইন্টার্স। বোধহয় আমার জন্যই আপনি এই পোষাক পরেছেন?

হ্যাঁ, আমার মনে হল, অন্ততঃ পনেরজন কেরানীর সাদামাটা পোষাক দেখে একঘেয়েমি দূর করবার জন্য আমি অন্য ধরনের পোষাক পরলাম।

আমি আপনাকে আরও কিছুক্ষণ বসিয়ে রাখতে চাইছিলাম–তীব্র দৃষ্টি হেনে বলল–কিন্তু আপনার ধূর্তামির জন্য আপনি জিতে গেলেন।

আমিও বিজয়ীর হাসি হেসে বললাম আমি সেটা অনুমান করেই আপনাকে চিঠি লিখেছি।

মিস শেলী ইঙ্গিতে বিছানার পায়ের দিকটা দেখিয়ে বলল–আপনি ইচ্ছা হলে এখানে বসতে পারেন।

আমি বসলে সে তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল ফার কোট নিয়ে আপনি কি যেন বলছিলেন?

আমি চলনসই একটা জবাব ভেবেই রেখেছিলাম। বললাম–দেখুন! আমি কয়েকটা প্রস্তাব রাখব কিন্তু আপনার অপছন্দ হলে যদি দয়া করে ভুলে যান সেটাই ভাল হবে।

আগ্রহ সহকারে মিস শেলী প্রশ্ন করল–ঠিক আছে, আপনি বলুন।

মিস শেলী, আমি বুঝতে পারছি আপনি ব্যাঙ্কের কাজে সন্তুষ্ট নন। নদীর এপার–ওপারের মতই ব্যবধান। আমি সেই ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে আপনার সঙ্গে কাজ করতে চাই।

এরপর ভূমিকা সাঙ্গ করে বললাম–কোট কেনার খরচটাআপনি নিজের খরচের হিসাবের মধ্যে দেখাতে চাইছে। কিন্তু সেটা ব্যাঙ্কের পক্ষে মানা সম্ভব নয়। ব্যাঙ্ক যে কাজ করে প্রত্যেকটার রসিদ থাকে। যদিও ইনকাম ট্যাক্সের অফিসাররা রসিদ আদৌ দেখেনা। তারা ব্যাঙ্কের কথাই মেনে নেয়।

মিস শেলী বললেন, ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না।

তার দিকে তাকিয়ে বললাম ব্যাপারটা জালিয়াতি করা। এক্ষেত্রে ছদ্মকেশ পরাতে হবে। এক অর্থে বলে কর ফাঁকি দেওয়া। যার জন্য জেল বা জরিমানা দুটোই হতে পারে।

ফাঁকিটা কি ধরা পড়ে যেতে পারে?

তার কথা শুনে বুঝলাম জালিয়াতির নাম শুনে সে ভয় পেয়ে যায় নি। তার অর্থ এই ধরনের মেয়েকে সহজেই কায়দা করতে পারা যাবে। আমি নরম গলায় বললাম–আমি যেভাবে কাজটা করব, তাতে ধরা পড়বার আশঙ্কা নেই।

কিভাবে করবেন? সেটা বুঝিয়ে বলুন!

উনিশশ ছত্রিশ সালে আপনার বাবা গোটা তিনেক কারখানায় মেরামতির কাজ করেছিলেন এবং সেইমত ইনকামট্যাক্স দপ্তর থেকে ছাড়পত্র নিয়ে তিরিশ হাজার ডলার নিজের খরচের মধ্যে দেখিয়েছিলেন। এক্ষেত্রেইনকামট্যাক্সের লোকেরা রসিদনা দেখেই ব্যাঙ্কের বয়ান জেনে নিয়েছিল। সেই রসিদগুলো আমি পাল্টে নতুন করে নিয়েছি। আমার স্থির বিশ্বাস ইনকাম ট্যাক্স সেগুলো দেখতে চাইবে না, ব্যাঙ্কের বয়ানও মেনে নেবে।

আমি রসিদগুলোর তারিখ পাল্টে দেব। কাজেই দেখুন, আপনার ফার কোটের চেয়ে বেশী টাকা, তিরিশ হাজার ডলার আপনার খরচের হিসাবে বেরিয়ে এল কি? এবার বলুন আপনি খুশী তো?

মিস শেলী বলল–মিঃ উইন্টার্স, আপনি বেশ বুদ্ধিমান। আমাদের দুজনের বোঝাপড়ায় ব্যবসাপত্তর এখন থেকে আমার মনের মতই চলবে।

তিনি মনের খুশীতে বেল বাজিয়ে চাকরকে দিয়ে একবোতল শ্যাম্পেন অর্ডার দিলেন।

আমি বিজয়ের উত্তেজনা মনের মধ্যে কোনরকমে চেপে রাখলাম। এখন কেবলমাত্র সাবধানে, ধীর, শান্ত মাথায় কাজ করতে হবে।

শ্যাম্পেন রুপোর পাত্রের মধ্যে বসিয়ে আনা হল। তার মধ্যে বরফের কুচি। বেশ কায়দা করে বোতলের ঢাকনাটা খুলল চাকরটা। তারপর সে দু গ্লাস মদ মিস শেলী আর আমার হাতে তুলে দিল।

একটু মুখে দিতেই মুখটা খারাপ হয়ে গেল। শ্যাম্পেনটা বাজে। বুঝলাম চাকরটা মজা করেছে।

যাকগে সে দিকে গুরুত্ব দিলাম না। মিস ভেস্তাল বাড়িভাড়ার ব্যাপারটা জানতে চাইল।

সঙ্গে সঙ্গে তাচ্ছিল্যের সুরে জবাব দিলাম–ওঃ বাড়িভাড়া! তাও হয়ে যাবে।

মিস শেলী জানতে চাইল উপায়টা।

বললাম–যে সংস্থা এখন ভাড়া আদায় করছে, তাদের পাল্টাতে হবে।

মিস শেলী অবাক হয়ে বলল–সেকি! ওরা তো গত চল্লিশ বছর ধরে কাজ করছে।

ভৃত্য যদি অকর্মণ্য হয়,বয়স্ক হয়, তাকে তো পাল্টাতেই হবে। পুরোনোবলে তো রেখে দেওয়া যায় না। আমি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম।

–দেখবেন, বাড়ির ব্যাপারে যেন এসব প্রশ্ন না ওঠে।

না, না, এসব ব্যাপারে আপনাকে চিন্তা করতে হবেনা। আমি নিজেকে আপনার চাকর বলে মনে করি না। আপনার চাকর অর্গিস নিজেকে চাকর বলে ভেবে খারাপ শ্যাম্পেন দিতে পারে, কিন্তু আমিও তাকে একদিন দেখে নেব। .

না, না, অত চটে যাবেন না অর্গিসকে আমি বলব।

ঠিক আছে। আমি বললাম।

–তাহলে যাবার সময় হ্যারিসন কোটের চিঠিটা লিখে দেব। আপনি সই করে রাখবেন।

মিস শেলী উত্তর দিল না। চিত হয়ে শুয়ে পড়লো বিছানাতে। আমি অবাক হয়ে দেখলাম–তার বুক বলতে কোন পদার্থ নেই। একেবারেই লেপাপোছা। একটা ছোট খাট পুতুলের মতই তাকে দেখাচ্ছে। সেউঠেবসে বলল–মিঃ উইন্টার্স আমাদের দুজনের সমঝোতা ভাল হবে বলেই মনে হচ্ছে। কি বলেন? তার খাড়া নাকটা কাঁপছে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম–আপনি তিনশ চৌত্রিশ নং ওয়েস্টার্ন অ্যাভিনিউ–এর বাড়িটা মিঃ বার্জেসকে বিক্রী করে দিতে ইচ্ছুক?

মিস শেলী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল–আপনি কি একদিনেই সব কাজ সেরে নিতে চাইছেন? এটার কি বন্দোবস্ত করলেন?

আমি শ্লেষের সঙ্গে বললাম–আপনি যদি আপনার বাবার স্মৃতিটাকে একটা বেশ্যালয়ের রূপ দান করতে চান, তাই করবেন। কেবলমাত্র আপনার অনুমতির অপেক্ষায়।

আমার এই নগ্ন কথাগুলো মিস শেলীর মনে বেশ দাগ কাটল বলেই মনে হল। কিন্তু বুদ্ধির জোরে আমাকে কিছু বুঝতে না দিয়ে বলল–ভাড়াটাদের নিয়ে একটা সমস্যা রয়েছে যা মিঃ লিডবেটার সমাধান করতে পারছে না।

ওসব নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না।

তীক্ষ কটাক্ষ হেনেমিস শেলীবলল–ঠিক আছে,বাড়িটা বিক্রীকরবার চেষ্টা করুন। আপনার বুদ্ধির দৌড়টা একবার দেখি কথাগুলো যেন সে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল।

মিস শেলীর উদ্দেশ্যে সঙ্গে সঙ্গে বললাম–আমি বার্জেসের সঙ্গে দেখা করতে চাই। এবং সেটা আজই।

কঠোর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল–আপনি যে একরকম আগুনে–বোমা।

তার প্রশংসা শুনে আমি বেশ উত্তেজিত হলাম।

এমন সময় মিস শেলী ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত দিল, এখনিই সে বেরোবে।

আমি বুঝতে পেরে উঠে দাঁড়ালাম। আমার সঙ্গে করমর্দন করে মিস শেলী বলল–আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে বেশ ভাল লাগল। আপনার কথা আমি মিঃ স্টার্নউডকে জানাব।

সুযোগ বুঝে আমি একটা দাও মারলাম–আপনি যদি আমার জন্য একটা গাড়ি আর একটা নিরাপদ অফিস ঘরের ব্যবস্থা করে দেন।

মুখে বিরল ভাব এনে মিস শেলী বলল–আপনাকে গাড়ি তো ব্যাঙ্কই দেবে।

আমি তার কথা বুঝতে পেরে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে বললাম–সব কাজ তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেলতে পারব।

আর আপনার এসকল গোপনীয় কাজ করব, তা সকলে দেখে ফেললে তাতে আপনারই ক্ষতি। গোপনীয়তা রক্ষা করবার জন্য একটা নিরাপদ ঘরের দরকার। ব্যাপারটা আপনিই ভেবে দেখুন।

থেমে বললাম–এসব গূঢ় কথা আমি ব্যাঙ্ককে জানাতে চাইছি না।

সে আমার দিকে কটমট করে তাকাল। মনে হল আমাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দেবে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের রাগকে সামলে নিয়ে সেবলল–আপনার স্নায়ুগুলো বেশ সতেজ দেখছি। মিঃ উইন্টার্স, আমি বাজি রেখে বলতে পারি মিঃ স্টার্নউড বা অন্যান্য কলিগরা আপনাকে চিনতে পারে নি। তাই এতদিন ধরে অন্যান্য কর্মচারীরা আমার অ্যাকাউন্টের ভার নিয়েছিল। ঠিক আছে, মিঃ স্টার্নউডকে বলে আমি আপনার জন্য একটা আলাদা অফিস ঘরের বন্দোবস্ত করে রাখব।

আর আমার ছটা গাড়ির মধ্যে একটা আপনি নিতে পারেন, অবশ্য সেটা দু–একদিনের জন্য।

আমি নিশ্চিত হলাম। যে দুনিয়া আমার কাছে স্বপ্ন মনে হয়েছিল, এখন তা আমার হতের মুঠোয়।

মিঃ অ্যাটর্নী দেখলেন কিভাবে তার গাড়ি, অফিসঘর সব আমার নিজের হয়ে গেল। এবার শুরু হল আমার আসল খেল।

মিঃ বার্জেসের কাছে গেলাম। বেঁটেখাটো মানুষ, রোগা চেহারা। মাথায় একটা টুপী। হকের মতই তার নাকটা বাঁকান। ব্যাঙের পেটের মত তার গায়ের রং ফ্যাকাশে।

একটা ঝরঝরে পুরোনো বড় টেবিলের এক পাশে বসে আছে একটা নেভা চুরুট ফোকলা দাঁতে চেপে।

তার টেবিলের মাঝখানে বসে আছে একটা মেয়ে। তার বুক দুটো কামানের মত উঁচু হয়ে রয়েছে। আর পাছা! যাকে বলে দেড়মণি নিতম্বা একটা আঙুলে টাইপ করে চলেছে।

কি চাই? যেন একটা খালি কৌটায় পয়সা পড়ল, এমন ঠংঠং আওয়াজ হল।

আমি আঙুল দিয়ে মিঃ বার্জেসকে দেখিয়ে বললাম–তোমার নিতম্বটা সামলে বসো খুকি। এটা তো সেই জায়গা নয়! বলে তার পাশ দিয়ে মিঃ বার্জেসের কাছে গেলাম। নিজের পরিচয় দিয়ে দিলাম। তিনি আমার পোষাক দেখে বললেন–আপনি তো সাদামাটা কেরানী নন, বরং সিনেমা স্টার বলেই মনে হচ্ছে।

তার কথার গুরুত্ব না দিয়ে বাড়ি বিক্রির ব্যাপারে আলোচনা সেরে ফেলতে চাইলাম।

তার সঙ্গে দরকারী সব কথা সারা হল। শর্ত থাকল এরকম, উনি বাড়িটা হাতে পেলেই বাড়ির ভাড়াটেগুলোকে উচ্ছেদ করে দেবেন।

কথা শেষ করে তার কাছ থেকে পারিশ্রমিক চাইলাম।

সে বলে–আপনি তো বেশ চালু ছেলে!

আমি তার কথায় গুরুত্ব না দিয়ে বললাম–আপনি আমার পাঁচশো ডলার মিটিয়ে দিলে বাড়িটা আপনার হয়ে যেতে পারে। না পোষালে বলে দিতে পারেন।

বার্জেস কিছুটা হতাশ হলেও পকেট থেকে মোটা মানিব্যাগটা বার করে গুনে গুনে পাঁচশ ডলার আমার হাতে দিল।

আমি টাকাটা হাতে নিয়ে নিজেকেই গালাগালি দিলাম। ভাবলাম, আরও একটু বেশি চাইলেই বোধহয় ভাল হত। বুড়োটাকে শুষে নিতে পারলে ভালই হত।

বার্জেস এবার আমার চোখে চোখ রেখে বললবাড়িটা চালু হলে একবার দেখতে আসবেন মেয়েগুলোকে চেখে দেখবেন। আশা করি আপনার এ বিষয়ে রস আছে।

আমি মাথা নেড়ে বললাম ঠিক আছে, কাল এক সময় এসে সই করাব আপনাকে দিয়ে। বাড়িটা আপনারই হয়ে গেল ভেবে নিন।

তাকে বিদায় জানিয়ে রাস্তায় চলে এলাম। দিনটা বেশ ভাল যাচ্ছে বলেই আমার মনে হল।

লিটল ইডেন এলাকায় পাঁচ ছটা সম্পত্তি তদারক সংস্থা আছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট সংস্থাটি হল স্টেইনবেক অ্যান্ড হোরে। ভাবলাম, এদেরকে ভার দিলে প্রাণপণ চেষ্টা করে এরা শেলীর ব্যবসা দেখাশোনা করবে।

বুলেভার্ড ফ্লোরাল দিয়ে গাড়ি চালিয়ে তাদের অফিসে গিয়ে হাজির হলাম। রিসেপশনিস্টের কাছে গিয়ে বললাম আমি প্যাসিফিক ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন থেকে আসছি।

মেয়েটি আমাকে বের্নি হোরের কাছে নিয়ে গেল। লোকটা মাঝবয়সী। ফুটবলের মত নীরেট গোল তার চেহারা।

আমি ঢুকতেই এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে করমর্দনের জন্যে হাত বাড়াল–আনন্দিত হলাম মিঃ উইন্টার্স বসুন

আমি বসতে বসতে নিজের পরিচয় দিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম–শেলী ফাউন্ডেশনের ভাগ আদায়ের কাজটা কি আপনারা করতে রাজি আছেন?

বের্নি হোরের মুখভাবের কোন পরিবর্তন ঘটল না। নাকটা চুলকে বলল–হ্যারিসন অ্যান্ড কোর্ট কি কাজটা ছেড়ে দিয়েছে?

উত্তরে বললাম–মিস শেলীই তাদেরকে ছাড়িয়ে দিতে চান। গত মাসের ভাড়ার রসিদের একটা বান্ডিল বার করে বের্নির হাতে দিয়ে বললাম–এর উপর বাড়তি পনের পার্সেন্ট ভাড়া আদায় করতে হবে।

অবশ্যই পারব, আপনি আমার উপর দায়িত্ব ছেড়ে দিন।

আমি বললাম–জানেন তো? দেশজুড়ে মিস শেলীর সম্পত্তি ছড়িয়ে রয়েছে। দায়িত্ব দিলে সব চালাতে পারবেন তো?

কেন পারব না? এটাই তো আমার কাজ। কিন্তু কথায় তেমন আগ্রহ দেখা গেল না।

আমি লোভ বাড়িয়ে দেবার জন্য বললাম–অবশ্য তিনি যে রাজি হবেন, এমন কোনও কথা নেই, তবে কিনা আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি।

বের্নি ছুরির ফলার মত দৃষ্টি চালিয়ে একবার দেখে নিল, তারপর বলল–ভারটা আপনি একবার দিয়েই দেখুন না। সিদ্ধান্ত আপনিই নেবেন।

বুঝলাম সে আমার মনোভাবটা বুঝেও বুঝতে পারছে না। সোজা ভাবেই কথাটা বলা উচিত ভেবে আমি হাসতে হাসতে বললাম–মিঃ বের্নি আমার মনে হয় ঘোড়র উপর বসে কথা বলার চেয়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে সামনাসামনি কথা বলাটা বোধহয় ভালই হবে।

শহরে আপনাদের মত সংস্থা আছে এবং সকলেই এই বিশাল শেলী সম্পত্তি তদারকির ভার পেলে ধন্য হবে। তাই না? আর সেই কাজটা আমি আপনাদের কাছে নিয়ে এসেছি, কোন স্বার্থে বলুন তো?

বের্নি হোরে এবার বুঝতে পারল, প্রশ্ন করল–আপনি কত চান। মিঃ উইন্টার্স?

মিঃ বের্নি আমাকে হাজার ডলার দিতেই হবে। আর পরিবর্তে মিস শেলীর সব সম্পত্তি দেখা শোনার ভার আপনি পাবেন।

ঠিক আছে, মিস শেলীর সই করা চিঠি আপনি আনলেই একেবারে নগদে হাজার ডলার পেয়ে যাবেন।

ঠিক আছে, বলে আমি তার অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। জানিয়ে দিলাম আগামীকাল দুপুরবেলায় আসব।

.

০৩.

অফিসের টেবিলে আমার নামে একটি চিরকূট পড়ে রয়েছে।মিঃ উনউডের কোন পাওনাদার এল, নাকি স্বয়ং বের্নি বা বার্জেস মিঃ স্টার্নউডকে গোপন তথ্যগুলো ফাঁস করে দিতে এল। ভয়ে আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

মিঃ স্টার্নউডের দরজায় নক করে ভেতরে ঢুকলাম। তার হাসিমাখা মুখ দেখে আমার ভুল ভাঙল।

তিনি সহাস্যে আমাকে বসতে বললেন–তারপর আমার উদ্দেশ্যে বললেন–তুমি যাদু টাদু করলে নাকি? মিস শেলী তোমাকে পেয়ে দারুন খুশী। তিনি নিজেই আমাকে ফোন করে তোমার প্রশংসা করলেন। কি ব্যাপার বলতো? তোমার জন্য আলাদা অফিস ঘর করে দিতে বললেন।

তোমার অফিস ঘর এতক্ষণে বোধহয় তৈরী হয়ে গেছে। উপযুক্ত ভাবে সাজাতে বলেছি। আর মিস গুডচাই তোমার স্টেনো হয়ে কাজ করবে।

আমি মৃদু হেসে বললাম–স্যার, অত উল্লসিত হবেন না। বড় লোকের খেয়াল তো!

তা যাকগে, এখন তুমি কিভাবে তিনটে সমস্যার সমাধান করলে সেটাই বলতো?–প্রশ্ন করলেন মিঃ স্টার্নউড।

আমি জানতাম এ ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। উত্তরের একটা ছক আমি তৈরী করে নিয়েছিলাম। একটু চিন্তিত ভাব এনে বললাম–আমি মিস শেলীকে ফার কোটের ব্যাপারে বলেছি এটাতে কর ফাঁকি দিতে হবে, সেক্ষেত্রে ধরা পড়লে আদালতের দ্বারস্থ হতে হবে।

বেশ বুদ্ধির কাজ করেছ–স্টানডড বললেন–আমরা এরকম ভাবে কোনদিন বোঝাতে পারি নি।

বাকি দুটোর কি করলে তাই বল।

এবারেও প্রথমে আমি ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বললাম–মাপ করবেন স্যার। এছাড়া আমার কোন উপায় ছিল না। তিনিই যে মালকিন, এটা প্রমাণ করবার জন্য বাড়িটা মিঃ বার্জেসকে বিক্রী করবার বন্দোবস্ত করেছি এবং শেলীফাউন্ডেশানের হয়ে বাড়তি শতকরা পনের ভাগআদায় করবার দায়িত্ব অর্পণ করলাম স্টেইনবেক অ্যান্ড হোরেকে।

মিঃ স্টার্নউডের চোখদুটো বিস্ফারিত হল। তিনি বললেন–বের্নি এক ধরনের অর্থ পিশাচ আর নির্দয়। জোচ্চোরও বটে।

আমিও তাকে এ ধরনের কথা বলেছি, কিন্তু তিনি আমাকে দাবড়ি দিয়ে উঠলেন–আপনারা আপনাদের চরকায় তেল দিন। বের্নি সব লুটেপুটে খাবে। স্যার, আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমার প্রভাবটুকু খাটিয়ে ওর রাশটুকু ধরে রাখতে পারি।

কিন্তু কিভাবে তুমি ওর ওপর প্রভাব বিস্তার করবে? বের্নিকে সামলান সোজা কাজ নয়। আর মক্কেলের ক্ষতি হোক এটা কোনভাবেই কাম্য নয়। আমি এখনি মিস শেলীকে ফোন করছি বলে তিনি ফোনের দিকে হাত বাড়ালেন।

আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। মিস শেলী তো এইসব ব্যাপারে কিছুই জানেনা।এখনি আমার দফার শেষ হয়ে যাবে। আমি সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে বললাম–উনি সাবধান করে দিয়েছেন, আমরা যদি ঐব্যাপারে কথা বলতে যাই তাহলে উনি আমাদের ব্যাঙ্ক থেকে

সমস্ত অ্যাকাউন্ট তুলে নেবেন। স্যার, আপনি খবরদার ফোন করবেন না। এতে আমাদেরই ক্ষতি হবে।

মিঃ স্টার্নউড আঁতকে উঠে হাত সরালেন ফোনের উপর থেকে।

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম–কিছু ভাববেননা স্যার। ভাড়া সংক্রান্তরসিদগুলো চেক করে আমি বেনিকে সোজা করে রাখব।

মিঃ স্টার্নউডের গলায় আশঙ্কার সুর শুনে আমি তাকে আশ্বাস দিলাম–নিশ্চয় আমি পারব স্যার।

তাকে প্রবোধ দিয়ে বললাম–একান্তই না পারলে তখন আপনি মিস শেলীর সঙ্গে কথা বলবেন।

এবারে আশ্বস্ত হলেন মিঃ স্টার্নউড; বেশ, তুমি যা করবার কর। তারপর হেসে বললেন–অন্ততঃ ফারকোটের ব্যাপারটা ভালভাবেই মিটিয়েছ তুমি। এ দুটোও পারবে।

এরপর আমি ধন্যবাদ জানিয়ে তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

.

০৪.

পরদিন প্রাতে যথারীতি আমি অফিস ঘরে এসে পৌঁছলাম। এতদিনে আমি বুঝতে পারলাম মিস শেলীর নাম ভাঙ্গিয়ে, তার জমান টাকা ভাঙ্গিয়ে বেশ কিছু ডলার আয় করা যাবে।

মনে মনে ভাবলাম, বার্জেসের কাছে আমি ঠকে গেছি কিন্তু বের্নি হোরের কাছ থেকে হাজার তিনেক ডলার আদায় না করে আমি ছাড়ব না। পরিকল্পনা মত একটা চিঠি তৈরী করলাম। কেবলমাত্র নাম সই করবার অপেক্ষায়। শেলীর অ্যাকাউন্টের খাতা পত্র খুলে দেখতে লাগলাম। মিস শেলীর অ্যাকাউন্ট সবই সরকারী বন্ড আর স্টকে কেনা। একেবারেই পাকা কাজ।

মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সোজা ওয়েস্ট সিটি স্ট্রীটের একটা বিশাল বাড়ির সামনে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে সোজাছতলায় উঠে গেলাম। এই বাড়ির খোপে অনেকগুলো অফিস। এখানে রায়ান ব্ল্যাকস্টেনের অফিস।

আমার পূর্ব পরিচিত সেই বন্ধুটির কাছে যেতেই সে আনন্দিত হল। বসতে বলল।

আমি বসতে বসতে বললাম–বিশাল শেলী অ্যাকাউন্ট থেকে কিছুটা খুঁটে তুলে নিলে হয় না?

সে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল–ওতে আমার কোন লাভ হবে না।

আমি রায়ানকে বললামধরো না, যদি আড়াই লাখ ডলার শেয়ার বাজারে ভাসিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সেই জিনিসের দাম বাড়বে না?

ঠিকমত লাগাতে পারলে অবশ্যই বাড়বে। যেমন ধর, কোনওয়ে সিমেন্ট। গত কদিনে পাঁচ পয়েন্ট দাম বেড়েছে। তবে জানই তো, এসব ব্যাপারে ঝক্কি একটা থাকেই।

আমি তাকে হাজার ডলার শেয়ারে লাগিয়ে দিতে বললাম। লোকসান হলে বড়জোর হাজার খানেক হবে। তার বেশী তো নয়?

রায়ান সেকথায় গুরুত্বনা দিয়ে বলল—এভাবে টাকা খাটাবার অধিকার তুমি কিভাবে পেয়েছ?

নরম গলায় জবাব দিলামব্যাঙ্কের কাছ থেকে নয়, স্বয়ং মিস শেলীর কাছ থেকে। তিনি হাজার খানেক ডলার লোকসানটাও মেনে নেবেন।

রায়ান লিখিত অনুমতি চাইল, সে সোজাভাবে রাজি হবে না বুঝতে পেরে তাকে বললাম–দেখ রায়ান, শেলীর অ্যাকাউন্ট নিয়ে কাজ করার অর্থ সহজেই বাজারে চড়চড় করে দর বেড়ে যাওয়া। তোমারও এতে লাভ হবে–আমারও লাভ হবে।

রায়ান বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল–তার মানে? ব্যাঙ্কে কাজ করে এসব কথা তুমি বলতে পার নাকি?

–ঠিক আছে। তুমি যখন রাজি হবে না, তখন আমি লোরেন অ্যান্ড ফ্র্যাঙ্কের কোম্পানীতে যাই। এরকম দাও ওরা হাতছাড়া করবে বলে মনে হয় না।

রায়ান তাড়াতাড়ি বলে উঠল–ঠিক আছে। আশা করি তুমি যা করছ, বুঝে শুনেই করছ। এখন তুমি কত চাও বল?

বেশী নয়! ফিফটি ব্রাদার–জবাব দিলাম।

আঁতকে উঠল রায়ান–একেবারে ডাকাতি। যাক্ তাহলে কোনওয়ে সিমেন্টের উপর লাগাবো তো? চিঠিটা সই করে দাও।

আমি চিঠিটাতে সই করে বললাম–স্টক কেনো আড়াই লক্ষ ডলারের। দুই বা তিন পয়েন্ট বাড়লে ঝেড়ে দাও। আজই।

রায়ান বললাম যদি বাড়তে থাকে তাহলে ধরে থাকবো তো?

না, আজই সম্ভব হলে ছেড়ে দেবে।মিস শেলীএকজন অর্থ পিশাচ। চটপট কিছু লাভ দেখাতে পারলে আমার উপর খুব খুশী হবেন।

আরও কিছু বক্তব্য রায়ানের মাথায় ঢুকিয়ে চলে এলাম ওয়েস্টার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার ব্যাঙ্কে। সেখানে বার্জেসের কাছ থেকে পাওয়া একশ ডলার দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুললাম। তারপর লাঞ্চ সারবার জন্য ক্লোরিয়ান রেস্তোরাঁতে ঢুকলাম ভাল খাবার জন্য।

ভাবছিলাম কদিন আগে পাওনাদারদের তাড়ায় আমি অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। আর আজ পনের শ ডলার হাতের মুঠোয়। আরও কত টাকা আসবে।

লাঞ্চ সেরে সোজা অফিসে। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে নিয়ে বললাম–হ্যালোকে?

দূরভাষে ওপ্রান্ত থেকে ভেসে এল–আমি মিস ডোলান বলছি। আপনি কি মিঃ উইন্টার্স।

হ্যাঁ। আমি বলছি।

তার কাছ থেকে জানতে পারলাম–মিঃ হোরে এখনি এখানে এসেছিলেন। মিস শেলী আমার উপর রেগে রয়েছে।

আমি তাকে জানালাম এখনি যাচ্ছি। এদিকে ইভ ডোলানের কাছে সংবাদ পেয়ে আমি চোখে অন্ধকার দেখলাম। এক সূত্রতেই আমার সব আশা, স্বপ্ন ধূলিসাৎহয়ে গেল বোধহয়। আমি ভাবতে পারিনি বজ্জাত হারামজাদা বের্নি খোদ মালিকের কাছে হাজির হবে।

অফিস, গাড়ি, সুন্দরী স্টেননা, বেনির হাজার ডলার, রায়ানের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ডলার, সবার উপর চাকরী। সব হাতছাড়া হয়ে যাবে আমার।

অফিস থেকে বেরিয়ে তিনটে ডবল পেগ হুইস্কি গলাধঃকরণ করে মিস শেলীর দেওয়া ক্যাডিলাক গাড়িটা বাতাসের থেকে দ্রুতবেগে চালিয়ে সাত মিনিটের মধ্যে তার বাড়িতে চলে, এলাম।

অর্গিস এগিয়ে এসে বলল–মিস শেলী অপেক্ষা করছেন ঐ লনে।

আমি তার সামনা সামনি পড়ে গেলাম। ব্যাঙ্গের স্বরে মিস শেলী আমার দিকে ছুঁড়ে দিল– এই যে, চতুর চুড়ামণি মিঃ উইন্টার্স!

কি বলুন–শান্ত স্বরেই তাকে শুধোলাম।

এবার কিভাবে নিজেকে বাঁচাবেন? এরই মধ্যে হাজার ডলার ঘুষ পকেটস্থ্ করলেন!

আমি বললাম কি বলছেন আপনি? আমি তো

মাঝপথে আমাকে থামিয়ে দিয়ে মিস শেলী বিদ্রুপের স্বরে বলল–আপনি মিঃ হোরেকে চেনেন না?

হ্যাঁ, চিনি। অতবড় উকিল। আপনার ফাউন্ডেশনের ভাড়া আদায়ের এর চেয়ে যোগ্য লোক অন্য কেউ নেই।

কিন্তু আমার অনুমতি ছাড়া বের্নিকে ভাড়া আদায়ের জন্য কে অধিকার দিল, আর হাজার ডলার ঘুষ নিতে আপনার লজ্জা করে নি?

আমি সঙ্গে সঙ্গে মেজাজের সঙ্গে উত্তর দিলাম–মিস শেলী, এটাকে ঘুষ বলবেন না। এটা কমিশন আদায় করছি ভাবুন।

মিস শেলি এবার ভীষণ রেগে গেলো–চোপরাও বদমাশ, জোচ্চোর কোথাকার। তুমি আমার নাম করে পকেট ভরাচ্ছ।

আমি বলে উঠলাম–বীর কুৎসিত মেয়েগুলোর মত চেঁচাবেন না।

ইভ ডোলান আমাকে এই পরামর্শ দিয়েছিল যে, মিস শেলী রেগে গেলে তাকে ঠাণ্ডা করার একমাত্র উপায় হল কোন অজুহাত না দেখিয়ে, ক্ষমা না চেয়ে, উল্টে ধমক দেওয়া। তাকে আমি চিনি, তার ভেতরে যত রাগ, বাইরে ততই ভীতু।

ওষুধে কাজ হল। মিস শেলীর কুৎসিত মুখখানা বেলুনের মত চুপসে গেল। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল দাঁড়াও হারামজাদা, তোমাকে ব্যাঙ্ক থেকে তো তাড়াব, এই শহরে যাতে থাকতে না পার সে ব্যবস্থা আমি করছি।

আমি চেঁচিয়ে বলে উঠলাম–ওরে ভয় দেখানোতে মিঃ উইন্টার্স ঘাবড়ায়না। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে আমি তেড়ে গেলাম। কি ভেবেছেন আপনি নিজেকে।

শয়তান এখনি তুমি মজা টের পাবে।বলেই ফোন করতে উদ্যত হল।

আমি ছুটে গিয়ে তার হাতটা চেপে ধরলাম।

সঙ্গে সঙ্গে আমার গালে সজোরে এক আঘাত করল। ভয়ে আমি চোখ বুজিয়ে ফেলেছিলাম, বুঝতে পারলাম–তার নখে আমার চামড়া চিরে গেছে। জ্বালা করছে।

মাথায় আগুন উঠে গেল, তার দু কাঁধে থাবা মেরে চেয়ারে জোর করে বসিয়ে দিলাম। ভয়ে তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে তা লক্ষ্য করলাম। দেহটা কাঁপছে। আমি কোন কিছু গ্রাহ্য না করে বললাম–শুনুন, আমার কথাগুলো। আপনার ফার কোটের ব্যাপারটা

মীমাংসা করে আপনাকে ত্রিশ হাজার ডলার পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছি। বাজেকে বাড়িটা বিক্রি করবার ব্যবস্থা আমিই করেছি আর বাড়ি ভাড়ার ব্যাপারটাও একদিনে সমাধান করে দিয়েছি। পাঁচঘর ভাড়াটের হাত থেকে আপনাকে রেহাই দিয়েছি, যা ঐ লিডবেটার মাসের পর মাস করে দিতে পারে নি। আপনার জন্য এতগুলো ডলার রোজগারের ব্যবস্থা করে দিলাম আর রক্তচোষা শয়তানদের কাছ থেকে নিজের জন্য নূন্যতম ছিটেফোঁটা কমিশন আদায় করেছি, তাতেই আপনার গায়ে জ্বালা ধরছে? আমি তো আপনার টাকা চুরি করিনি! আপনি আমার চাকরিটা খোয়াতে চান? ঠিক আছে। তবে আপনি মনে রাখবেন, আমার সাহায্য ছাড়া ঐ তিরিশ হাজার ডলার পাবার স্বপ্নও ঘুচে যাবে, উল্টে কর ফাঁকি দেবার অভিযোগে আশ্রয় পাবেন সোজা জেলখানায়। আপনার সুনামে সারা দেশ করতালি দেবে। এবার ফোন করুন। করুন ফোন কথাগুলো এক ঝটকায় বলে বাইরের লনে চলে এলাম।

যেন একটা যুদ্ধ করে এলাম। সিগারেট টানছি। এমন সময় অনুভব করলাম মিস শেলীদাঁড়িয়ে রয়েছে আমার পাশে। বেশ একটা আদুরে অভিযোগের সুরে বলে উঠল– আমাকে ব্যথা দিয়েছে, কাদালেন আমাকে।

আর আপনি আমার কি হাল করেছেন দেখুন। গালের ক্ষতটা থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। রুমালটা ক্ষতস্থানে চেপে ধরে বললাম–আপনার ভাগ্য ভাল যে আপনার ঘাড় মটকাই নি।

সে ধপ করে আমার পাশে বসল, আপনি শুধু নিজের চিন্তাতেই ব্যস্ত। আমার জন্য না হয় একটু করলেন। তার কদাকার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম মনে ব্যথা পেয়েছে।

মিস শেলী শ্যাম্পেনের অর্ডার দিল। অর্গিসকে ধমকের সুরে বলে দিলাম, সবচেয়ে ভাল জাতের শ্যাম্পেনটা চাই, না হলে বোতলটা তোমার মাথায় ভাঙব।

সে যেন একেবারে আমাকে ভস্ম করে দেবে–এরকম দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল।

যাক, যুদ্ধে আমি জিতে গেছি। সাফল্য আমার হাতের মুঠোয়। আমি রিসিভারটা তুলে ব্ল্যাকস্টেনকে ফোন করলাম। সে জানাল–এইমাত্র সে শেয়ার বিক্রী করেছে। মোটামুটি পঁয়ত্রিশ হাজার ডলার লাভ হয়েছে। আমার কমিশন হিসাবে পাব নশো ডলার।

সেখান থেকেই একবার মিস শেলীর দিকে তাকালাম। শুকনো ডিগডিগে চেহারা নিয়ে চেয়ারের ওপর বেঁকে বসে আছে। বুক বলতে কোন পদার্থ নেই। সৌন্দর্যের স্পর্শমাত্র নেই।

মিস শেলীর দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রায়ানকে বললাম–মিস শেলীর চেকটা আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

রায়ান ইতস্ততঃ করছে বুঝতে পেরে আমি বললাম তুমি আমার হয়ে কাজ করছ, মিস শেলীর হয়ে নয়।

রিসিভার নামিয়ে রেখে ভাবতে ভাবতে এলাম–আমাকে চড় মারার খেসারৎ দিতে হবে তোমাকে পনের হাজার ডলার, আর তুমি পাবে কুড়ি হাজার ডলার। এতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে তোমাকে।

আমাকে দেখে মিস শেলী জামার চেনটা টেনে দিয়ে মৃদু হেসে লজ্জিত কণ্ঠস্বরে বলল–আপনি বুঝি উঁকি মেরে দেখছিলেন! ছিঃ, কুমারী মেয়েদের খোলা বুক ঐরকম ভাবে দেখতে নেই। কথাটা বলে মাথা নীচু করল।

আমি তার কথা বুঝতে পারলামনা। বলে কি? মিঃ শেড উইন্টার্স তাকাবে এই সুটকীর দিকে, যার একটা ডাক শুনে দশটা সুন্দরী এখানে হাজির হবে! যা আমি ঠোঁটে লজ্জিত হাসি এনে বললাম–লজ্জা দেবেন না, এইমাত্র আপনার বিশ হাজার ডলার আয়ের বন্দোবস্ত করে এলাম। সে জন্য অবশ্য আপনার আড়াই লক্ষ ডলার খাটাতে হয়েছে।

মিস শেলী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল,আমার অনুমতি না নিয়ে আমার টাকা ব্যবহার করেছেন?

জবাব দিলাম–টাকা নয়, আপনার সুনামের সদ্ব্যবহার করেছি মাত্র।

মিস শেলীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম–যে কোন জিনিসের উপর আড়াই লক্ষ ডলার দাম হলে স্টকের দাম বাড়তে বাধ্য। এক্ষেত্রে চার পয়েন্ট বেড়েছে।

আমার চোখে চোখ রেখে মিস শেলী বলল–মিঃ উইন্টার্স, আপনি কাজের লোক বটে তবে ভীষণ ধুর্ত ও চালাক।

আমি বললাম–ডাকাত, জোচ্চোর বলুন। মিস শেলী যেন লজ্জা পেয়ে গেল। ক্ষমা চেয়ে বলল–তখন আমি রেগে গিয়েছিলাম আর আপনারও ক্ষমা চাওয়া উচিত। কেননা আপনি আমাকে আঘাত করেছেন।

ঠিক আছে, আমি ক্ষমা চাইছি কিন্তু আমি যে এত কাজ করলাম এবং সব কথা আপনাকে খোলাখুলি ভাবে বললাম, এতে কি আপনার খুশী হওয়া উচিত নয়?

এমন সময় অর্গিস বরফের উপর বসানো মদের বোতল ট্রেতে করে নিয়ে এল। এক গ্লাস ভর্তি করে আমার হাতে ও আরেকটা মিস শেলীর হাতে তুলে দিল। আমি এক চুমুক খেয়ে বললাম–অনেকটা ভাল। এবার আমি মিস শেলীর কাছে জানতে চাইলাম মিঃ হোরের সঙ্গে কি কথা হয়েছিল।

তখন আমার মেজাজটা ভাল ছিল না, পরে দেখা করতে বলেছি।

–ভালই করেছেন, আপনার ভাড়াটেদের কাছ থেকে বাড়তি পনের পার্সেন্ট ভাড়া আদায় করবার ক্ষেত্রে সে একজন যোগ্য ব্যক্তি। আর তার রাশ টেনে রাখবার জন্য আমার প্রয়োজন।

মিস শেলী আমার কথা শুনে মুগ্ধ হল। বলল–আপনি যে আমার পাশে পাশে আছেন, এটা ভেবেই আমি আনন্দিত। এতক্ষণে হাফ ছেড়ে বাঁচলাম।

বললাম–আমি যে আপনার মঙ্গলাকাঙ্খী তার প্রমাণ কি আপনি পান নি?

মিস শেলী খুশির উচ্ছ্বাসে ঐ দিন রাত্রে তার সঙ্গে ডিনার খাবার আমন্ত্রণ জানাল।

আমি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম–আজ রাতে যে পার্কসাইড স্টেডিয়ামে লড়াই দেখতে যাব। আপনার কথা না রাখতে পারার জন্য দুঃখিত।

মিস শেলীর লড়াই দেখতে খুব ভাল লাগে জানিয়ে আমার সঙ্গে যাবার আবদার করল।

আমি এরকমই কিছু চাইছিলাম। মিস শেলীর পাশে পাশে হাঁটা, একসঙ্গে ডিনার খাওয়াতে সমাজে আমার দর হুহু করে বেড়ে যাবে। আমি ভেবে নিলাম–আজকে যে সুন্দরী মেয়েটিকে আসতে বলেছি তাকে ফুটিয়ে দেব।

মিস শেলীকে ঠিক সাতটার সময় নিতে আসব বলে তার কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

যুদ্ধ জাহাজের মতই রোলস রয়স গাড়ি

০৫.

স্টেডিয়ামের গেটে যুদ্ধ জাহাজের মতই রোলস রয়স গাড়ির ভিড়। গাড়ি থেকে নেমে মিস শেলীর সঙ্গে স্টেডিয়ামে পদার্পণ করতেই আমার মনে হল আজকেই সবচেয়ে আনন্দের দিন।

মিস শেলীর চেহারাটা কদাকার হলেও রুচিপূর্ণ সাদা পোষাক ও হীরার গহনাতে সর্বাঙ্গ মোড়া ছিল। আমরা যখন ডিনার খাচ্ছি, তখন সাংবাদিক কয়েকজন ঘন ঘন ছবি তুলছিল। নড়ে চড়ে বসলাম। মনটা খুশীতে মেতে উঠল।

এমন সময় বেশ কাঠখোট্টা গোছের একজন লোক মিস শেলীকে অভিবাদন জানাল। মিস শেলী তার পরিচয় দিলেন আর তাতে বুঝতে পারলাম–ইনি স্যাম লেগো, স্থানীয় পুলিশে রয়েছেন।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম ওর সঙ্গে আমার পটবে না। মিঃ লেগো জানালেন তিনি প্যাসিফিক ব্যাঙ্কে পূর্বে আমাকে দেখেছেন।

আমি কেরানীর পরিচয়টা ভুলবার জন্য বললাম কত লোকই তো ব্যাঙ্কে আসে, ঠিক মনে থাকে না।

এরপর মিস শেলীকে নিয়ে এসে রিং এর নির্দিষ্ট ধারে বসলাম।

মিস শেলীকে প্রতিযোগী দুই বক্সার সম্পর্কে পরিচয় দিলাম। মিডিলওয়েট চ্যাম্পিয়ন বক্সার জ্যাক স্লেড আর অখ্যাতনামা ডাকি জোন্স। মিস শেলী সেই অখ্যাতনামা জোন্সের উপর একশ ডলার বাজি ধরল। তাকে বারণ করা সত্ত্বেও সে শুনল না। শেষে জনসনের কাছে গিয়ে জোন্সের উপর মিস শেলীর একশ ডলার আর স্লেডের ওপর আমি পঞ্চাশ ডলার বাজি ধরলাম।

লড়াই শুরু হবার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই জোন্স বিখ্যাত স্লেডকে ঘুষি মেরে চোয়াল ভেঙ্গে দিল। বোঝা গেল স্লেডের এই ম্যাচ জেতা সম্ভব নয়। মিস শেলী উত্তেজনায় যেন পাগল।

প্রচণ্ড ভিড়। মিঃ লেগো আমাদের ভিড়ের মধ্যে রাস্তা করে নিয়ে এলেন। সে কি দারুণ কষ্ট। একটা আধো অন্ধকার জায়গাতে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। স্টেডিয়ামের গরম হাওয়ার স্পর্শ এখনও অনুভব করছি।

আমি মিস শেলীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম–এখন কেমন বোধ করছেন?

ভালই। গরম আর উত্তেজনায়–এরকম অনুভূতি আমার আর কখনও হয়নি।

তার চোখের দিকে তাকিয়ে যে দৃষ্টি দেখলাম, তাতে আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তার হাড়ের কাঠামোর উপর সরু চামড়ার শরীরে এমন উত্তেজনা থাকতে পারে যা চরম কামোত্তেজনার চেহারা। তার চোখে মুখে এমন দুর্জয় আসক্তি

ফুটে উঠেছে, মনে হচ্ছে সে এখনি সর্বসমক্ষে পথের মাঝেই আমাকে আলিঙ্গন করবে। আমি সংকুচিত হয়ে গেলাম, এক নিদারুণ অনিচ্ছায়।

আমার মনের ভাব মিস শেলী বুঝতে পারল। চট করে বলল–যান, বাজীর টাকাটা এখনি নিয়ে আসুন।

আমি ফিরে এসে দেখলাম–গাড়িটা নেই। মিঃ লেগোর কাছে জানতে পারলাম, মিস শেলী চলে গেছেন।

বোধহয় গরম আর লড়াইয়ের উত্তেজনা–আমার কথার মাঝে মিঃ লেগো বলল–এটা লড়াই না পতন?

আমার চাকুরী জীবনে এরকম অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। আসলে মানুষ যখন চরম আত্মতুষ্টিতে ধরাকে সরা জ্ঞান করে, তখন আচমকা ঘুষি খেয়ে তার চোয়াল ভেঙ্গে যায়, মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আরও কত কী হয়!

আমি তার হাত থেকে বাঁচবার জন্য বললাম ঠিক আছে আমি চলি। শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিলাম।

সোজা ফ্ল্যাটে চলে এলাম। দেখলাম আমার পুরোনো প্রেমিকা গ্লোরী একটা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে বসে আছে। তার বুকদুটো কালো ব্রা ফুঁড়ে বেরুতে চাইছে আর এক চিলতে লাল রংএর জাঙ্গিয়া কোন রকমে লজ্জা স্থানটুকু ঢেকে রেখেছে। তার উরু অবধি নেটের মোজা আর ডান হাতে হুইস্কির গ্লাস।

গ্লোরি আমাকে দেখেই প্রশ্ন করল–এই যে খোকা! ভেন্তালের সঙ্গে খেলাটা কেমন জমল?

বলছি। অপেক্ষা করলে রিসিভার তুলে নিয়ে মিস শেলীর উদ্দেশ্যে ফোন করলাম। মিস ডোলানের কণ্ঠস্বর–শেলী হাউস থেকে বলছি, কাকে চাই?

আমি বললাম–আমি মিঃ উইন্টার্স! আমি মিস শেলীর সঙ্গে কথা বলতে চাই, উনি তো আমাকে না জানিয়ে চলে এসেছে।

ঠিক আছে, আপনি একটু ধরুন,বলল ইভ ডোলানকিছুক্ষণ পরে তার কাছ থেকে জানলাম মিস শেলী শুয়ে পড়েছে। আজ আর কথা হবে না।

আমি বলতে চাইছিলাম কিছু শুনুন মিস ডোলান–যাঃ লাইন কেটে গেল। মরুক গে, যাকগে!

তুমি দেখছি আজকাল বেশ ন্যাকা ন্যাকা অভিনয় করছ। ব্যাপারটা কি বলতো? বোধহয় মিস শেলীকে রাগিয়ে দিয়েছ?–তার কথায় কর্তৃত্বের ছাপ সুস্পষ্ট।

আমি রেগে গিয়ে বললাম–গ্লোরি, তুমি যা বোঝ না, তা নিয়ে কথা বলল না।

গ্লোরি বেশ বিরক্ত হয়েই বলল–ভেবেছিলাম, তোমার কিছু অন্ততঃ বুদ্ধি আছে কিন্তু তুমি–তুমি কিনা সাতকোটি ডলারের মালকিনকে চটিয়ে দিলে।

আমি বাথরুমে যেতে গিয়েও থেমে দাঁড়ালাম। বললাম–তবে না তো কি ঐ রকম একটা কুৎসিতবাঁদরের সঙ্গে প্রেম করব?বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করব? রাস্তার মাঝখানে!

গ্লোরি আমার কাছে এগিয়ে এল।বলল,বুঝছনা কেন, তুমি চুম্বন করবেসাত কোটি ডলারের মুখে, ঐ কুৎসিত বাঁদরটার মুখে নয়। সে আমাকে পরামর্শ দিল মিস শেলীকে বিয়ে করতে।

আমি বিস্মিত হলাম–কি বলছ? ঐ বাঁদরীর সঙ্গে সারা জীবন কাটাতে হবে?

গ্লোরি আমাকে বুঝিয়ে বলল–আগে তোমার কাজ সাত কোটি ডলার হাতান। আর তুমি বিয়ে করবে তার মানে তো এই নয় যে তুমি আর কোথাও মজা করতে পারবে না।

একটু থেমে বলল–তুমি আমাকে একটা ফ্যাশনেবল ফ্ল্যাট কিনে দেবে। সেখানে তো সবসময় তোমার জন্য আমি রেডি হয়ে থাকব। প্রিয় শেড, তুমি এ সুযোগ হাতছাড়া করো না। মিস শেলী যদি তোমার কাছে প্রেম, ভালবাসা না পায়, তাহলে সে বিগড়ে যাবে। হতাশায় দুর করে তোমাকে তাড়িয়ে দেবে। টাকা তো পাবেই না, বড় দুর্নাম হবে তোমার। শেড শোন, সিরিয়াসলি ভাবো।বলতে বলতে গ্লোরি আমাকে পিছন থেকে নিবিড় আলিঙ্গন করল। তার দুই সুপুষ্ট স্তন। আমার পিঠের সঙ্গে চেপে রইল।

গ্লোরি আমাকে পরামর্শ দিল আগামীকাল প্রাতে মিস শেলীর জন্য একগুচ্ছ সাদা ভায়লেট ফুল পাঠিয়ে দিতে।

আমি তার প্রশংসা না করে পারলাম না। অন্ধকারে সব মেয়েই সমান। কিন্তু সাত কোটি ডলার সবসময় সাত কোটি।

.

০৬.

সাত কোটি ডলারের চিন্তা মাথায় রেখে গ্লোরির পরামর্শ মত এগিয়ে গেলাম আর এক মাসের মধ্যে ভেস্তাল শেলীর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ফেললাম। অবশ্য পরিণয়ে আমার পরিচয়ের পরিণতি টেনে আনতে অনেক বুদ্ধি খাটাতে হয়েছে। তবে একটা সুবিধা ছিল, আমিই একজন সুশ্রী যুবক ওর জীবনে প্রথমে এলাম, তাছাড়া ও কারুর কাছ থেকে ভালবাসা পায় নি।

বিয়ের আগেই ভেস্তাল আমার নামে আড়াই লক্ষ ডলার দিল, যা বাজারে পুরোদমে খাটছে। যা লাভ হবে সবই আমার।

ওর প্রস্তাব কয়েকটা অফিস খুলতে হবে। ওর বিষয় সম্পত্তি দেখাশোনা করবার জন্য বেশ কয়েকজন লোক নিয়োগ করতে হবে। আর বলাই বাহুল্য, এই কাজে আমার বেশ কিছু লাভ হয়েছে। সাত কোটি ডলারের উপর আমার পুরো অধিকার না থাকলেও ঐ একই অঙ্কের স্টক আর বন্ডের কাগজগুলোকে ধার পাবার জামিন হিসাবে সহজে আমি ব্যবহার করতে পারব। আর ব্ল্যাকস্টেনের সাহায্যে বেশ মোটা অঙ্কের ডলার আমি ঘরে তুলতে পারব। বেশ চমৎকার খেলা শুরু হল।

যাক আমাদের বিয়েতে ভেস্তাল জাঁকিয়ে অনুষ্ঠান করল। তার ইচ্ছা সারা পৃথিবীর লোককে ও দেখাবে, সে একজন সুপুরুষ, সুন্দর, সুশ্রী যুবককে স্বামী হিসাবে বরণ করছে। গণ্ডাখানেক ব্যান্ডপার্টি, ব্যালের অনুষ্ঠান, বেশ জমকালো পোষাক পরে বল নাচ আর দুমদাম আতসবাজী। হাজার খানেক বিশিষ্ট ব্যক্তি আমন্ত্রিত হয়েছে বিবাহ সভাতে।

আমি অবশ্য চেয়েছিলাম চুপি চুপি বিয়ের পাট চুকিয়ে ফেলতে। কিন্তু ভেস্তালের আবদারের কাছে আমার ইচ্ছা ধোপে টিকল না।

বিয়ের পর আমাদের হনিমুন হবে ভেনিসে। ভেস্তালের একটা সুসজ্জিত বিশাল মোটর বোট থাকবেইতালিতে। বোটে করে আমরা যাব ভেনিসে আর প্রথমে আমরা বিমানে করে যাব ইতালীর নেপলসে। দেড় মাস ধরে হবে আমাদের হনিমুন।

এর মধ্যে ক্রাউন বুলেভার্ড এলাকায় কয়েকটা অফিস ঘর নিয়ে লিডবেটার আর মিস গুডচাইল্ডকে কাজের দায়িত্ব দিয়ে নিজের স্বার্থ গোছাতে তৎপর হলাম।

দেশের সবচেয়ে ধনী মহিলার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে আমার। কেরানী থেকে একেবারে টাকার গদীতে, যা স্বপ্নেও অকল্পনীয়। কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি সুখের মুহূর্ত বেশিদিন থাকে না।

.

০৭.

বিয়ের রাতে সবাই বোধহয় আমার মনোভাব বুঝতে পেরেছে। ভাবছে, আমি বেশ পাকা খেলোয়াড়। স্বামী স্ত্রীর মিলন বাসর অনিবার্যভাবেই এসে পড়ল অনুষ্ঠান পর্ব শেষ হতে। তখন মাঝরাত। সোজা বিমানবন্দরে এসে আমাদের বিশেষ সংরক্ষিত বিমানে উঠলাম। প্রথমে প্যারিসে এলাম, সেখানে রিৎজ হোটেল, দামী সুইট, রাতটা যেমন করেই হোক ওর সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। সারাটা বিকাল পরিকল্পনা মাফিক ওকে নিয়ে ঘুরলাম। ভোর চারটের সময় হোটেলে পৌঁছোবার পর দেহের মধ্যে শ্রান্তভাব ফুটিয়ে তুলে আমি বিশ্রাম করবার অজুহাত দেখালাম।

ভেস্তাল অবাক হলেও মুখে কিছু বলল না। তারপর কয়েক ঘণ্টা ঘুমোবার পর প্যারী থেকে নোম। রোম থেকে মোটরে করে নেপলসে সেখানে তিনদিন থাকা হবে।

ভেস্তাল দর্শনীয় সব জিনিস দেখে চলেছে। পম্পেই, ক্যাপ্রি, ভিসুভিয়াস। সন্ধ্যাবেলা দুজনে সাঁতার কাটছি, এক সময় ও বলল–শেড ডার্লিং, আজ রাতে একটু তাড়াতাড়ি ফিরব। বিয়ে হয়েছে আজ তিনদিন হল।

ও কথা সম্পূর্ণ না করলেও আমি বুঝতে পারলাম ওর ইঙ্গিত। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে ফেলতে কোনরকমে চেপে গিয়ে বললাম–হ্যাঁ ডার্লিং, আজ তাড়াতাড়ি ফিরব।

মনে মনে ভাবলাম–যা কপালে আছে তা তো ঘটবেই। এই যন্ত্রণা আমাকে ভোগ করতেই হবে। সাত কোটি ডলারের কথা চিন্তা করে নিজের মনকে প্রবোধ দিলাম।

অন্ধকারে দুজনে পাশাপাশি শুয়ে আছি। যেন অচেনা পরস্পর। মনটাকে কোনমতে শক্ত করে নাক টিপে ভেস্তালকে দু–চারটে চুম্বন করলাম। পেটের ভেতরটা পাক দিয়ে উঠল।

বুঝলাম, ভেস্তাল তৃপ্ত হয়নি। না হবারই কথা কিন্তু আমার মন চাইছে না, সেখানে শরীর সাড়া দেবে কিভাবে?

তারপর থেকে দুজনেই চুপচাপ, বিষণ্ন। আমাদের সঙ্গে ইভ ডোলানও এসেছিল।

ডোলানকে দেখে তার প্রতি দিনদিন আকর্ষণ আমার ক্রমশই বেড়ে চলেছে।

আমরা ভেনিসের উদ্দেশ্যে জাহাজে চেপেছি। ডোলানকে কায়দা করবার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম।

রাতে ডিনার সেরে ডেকে এসেবসলাম–ভেস্তাল নাচের রেকর্ড চালিয়ে আমার সঙ্গে নাচতে চাইল। আমি রাজি না হওয়াতে ও চুপসে গেল।

এদিকে উপসাগর ঘিরে আলোকমালা সুসজ্জিত লক্ষ লক্ষ তারার ঝিকিমিকি লালচে নীল আকাশের ক্যানভাসে।এত চমৎকার দৃশ্য দেখতে দেখতে আমার কেবলি মনে হচ্ছে ইভ ডোলানের কথা।

ব্র্যান্ডি খেতে খেতে আমি উঠে পড়লাম। একটু ঘুরে আসছি, তুমি যাও। নিশ্চয় খুব ক্লান্ত হয়েছ, শুয়ে পড়গে যাও।

ভেস্তাল প্রতিবাদ করে বলে উঠল–আমি মোটেও ক্লান্ত হইনি।

আমি শান্ত গলায় বললাম–একটু ঘুরে আসছি, এখুনিই ফিরব। কিন্তু তুমি যদি ঘুমিয়ে পড় তাই শুভরাত্রি আগেই জানিয়ে রাখলাম।

ওর কাঁধ চাপড়ে নীচের ডেকে নেমে এলাম। চাঁদের আবছা আলোয় ইভকে দেখতে পেলাম। সে লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে এসে ডেকের রেলিংবরাবর হেঁটে যাচ্ছে। আমিও তাকে অনুসরণ করবার জন্য যেই পা বাড়িয়েছি সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম একটা ছায়ামূর্তি ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ওরা আলোতে এসে দাঁড়াল। লোকটি জাহাজের সেকেন্ড অফিসার রোলিনসন। দুজনে পরস্পর ঘনিষ্ঠ হল। গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হল। আমার ভেতরটা হিংসায় জ্বলে গেল। ডোলানের একাকীত্ব ঘোচাতে এসে নিজেই একাকী হলাম।

কিছুক্ষণ পরে নিজের কেবিনে ফিরে এলাম। ভেস্তাল আর আমার ঘরের মাঝে একটা দরজা ছিল, সেটা ভেজান।দরজায় অতি সাবধানে কান পেতে শুনতে পেলাম ভেলের ফোপানি কান্নার শব্দ। তার ঘরের দিকে যাবার জন্য পা বাড়ালেও আমার মন রাজি হল না। অগত্যা নিজের বিছানায় একা শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকাল ছটায় জাগলাম। সূর্যের মৃদু মিষ্টি রোদ একটা সুন্দর আমেজ এনে দেয়। দাড়ি কামিয়ে সাঁতারের পোষাক পরে রেলিং–এর ধারে এলাম। মাত্র ত্রিশ গজ দূরে একটা মেয়ে সাঁতার কাটছে। ভাল করে লক্ষ্য করবার পর দেখলাম মেয়েটি ইভ ডোলান। নিজেকে সামলাতে না পেরে ওখান থেকে ঝাঁপ মারলাম নীল সমুদ্রের উচ্ছল জলরাশির মধ্যে।

তার কাছে পৌঁছে বললাম–সুপ্রভাত, মিস ডোলান।

ডোলানও তার প্রত্যুত্তর দিল।

আমি ডোলানের উদ্দেশ্যে বললাম–আসুন, একসঙ্গে দুজনে সাঁতার কাটি।

মিস ডোলান বলল–ক্ষমা করবেন, এক গাদা কাজ রয়েছে। ব্রেকফাস্ট করেই বসে পড়তে হবে। বলেই সে জাহাজের দিকে ফিরল।

তবে চলুন, একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট করি। নাছোড়বান্দা ভাবে বললাম। আমাকে মাপ করবেন, আমি মিসেস উইন্টার্স এর কর্মচারী মাত্র। উনি এসব পছন্দ করবেন না। কথা শেষ করেই সে তাড়াতাড়ি সাঁতরে গিয়ে জাহাজের ঝোলান সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল।

আমি চিৎ হয়ে ভেসে দেখতে লাগলাম। সাঁতারের পাতলা পোষাক ভেদ করে ইভের যৌন স্পষ্ট ভাবে আমার চোখে ধরা দিল। আমার চোখের সামনে তার নগ্ন শরীর বারবার ভেসে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে সারা মনে আগুন ধরিয়ে দিল।

তারপর তিনদিন কেটে গেছে। ভেস্তালকে নিয়ে দিনগুলো কাটাতে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে। আমার সঙ্গে ভেস্তাল আঠার মত লেগে রয়েছে। আমাকে সুখে আর খুশীতে রাখবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বেচারী। এদিকে আমি ডোলানকেও মন থেকে মুছে ফেলতে পারছি না। ডোলান আমার ইঙ্গিত বুঝেও কায়দা করে এড়িয়ে যাচ্ছে।

কেবলমাত্র লিটল ইডেনে ফেরবার আশায় বুক বেঁধে রয়েছি। একমাত্র তখনি সব ম্যানেজ করতে পারব।

শেড! ভেস্তাল ডাকল, বাধ্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকালাম–আমাকে বিয়ে করে তুমি বোধহয় সুখী হও নি, এখন অনুতাপ করছ, তাই না?

ভেস্তাল আমার এই মনোভাব ধরতে পেরে গেছে বুঝতে পেরে নিজের গালে নিজের চড় মারতে ইচ্ছা করল। সঙ্গে সঙ্গে আমি মুখে মৃদু হাসি এনে বললাম–তুমি এসব কথা ভাবছ কেন? আমি তো তোমাকে পেয়ে ভীষণ খুশী।

তোমার ব্যবহারই আমাকে ভাবাচ্ছে। ভেস্তাল বলল তুমি আমাকে ঘৃণা কর, তাই না?

আমি নিজেকে অভিশাপ দিলাম। মুখে হাসি এনে ওর কাঁধে হাত রাখতে যেতে ও বলল–না,, আমাকে ছুঁয়ো না, আমি তোমার কাছ থেকে এরকম ব্যবহার আশা করি নি। আমাদের হনিমুন নষ্ট করে দিয়েছ। এবার আমি বাড়ি ফিরে যেতে চাই। অনেক হয়েছে।

আমি ভয় পেয়ে গেলাম। ভাবলাম, বিবাহ বিচ্ছেদের কথা বলবে নাকি? আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম–ভেস্তাল! আমি হনিমুন নষ্ট করিনি, আসলে এই একঘেয়ে বেড়ানোতেই আমার বিরক্তি লাগে। আমরা দুজন দুজনকে ভালবাসি, তাই আমাদের একান্ত নিভৃতি প্রয়োজন।

ভেস্তাল সে কথায় গুরুত্ব না দিয়ে বলল–তুমি আমাকে ভালবাস না বলেই আমার সঙ্গে শুতে পর্যন্ত চাও না।

আমি নির্দোষের সুরে বললাম তুমি বরং চাও না আমার সঙ্গে শুতে। তুমি চাইলে আমি নিশ্চয়ই শোব।

এতেই কাজ হল। ভেস্তাল গলে গেল–নিশ্চয়ই চাই শেড আদুরে গলায় বলল–ওঃ শেড, তুমি আমাকে ভালবাস। বল শেড, তুমি একবার বল।

আমি সান্ত্বনার সুরে বললাম–কেঁদোনা, সব ঠিক হয়ে যাবে। তারপর একটু কষ্ট স্বীকার করে বাঁদরীর কুৎসিত দেহটা কোলে তুলে নিলাম। কাঁধে খামচি দিয়ে ধরেছেসে। ধপাস করে তাকে বিছানায় ফেলতে গিয়ে আমিও তার শুকনো দেহটার উপর পড়ে গেলাম! তারপর আলোটা নিবিয়ে দিলাম।

.

০৮.

এরপর বেশ কিছুদিন চলল ভেস্তালের সঙ্গে আমার প্রেমের অভিনয় আর অপরদিকে ইভ ডোলানের সঙ্গে জাহাজের সেকেন্ড অফিসারের প্রেমের খেলা।

আমরা ভেনিসে পৌঁছলাম। ভেনিসে এসে একদিন লাউঞ্জ থেকে বেরোতেই ইভ ডোলানকে ধরলাম।

এই যে মিস ডোলান, কেমন আছেন?

চোখের কালো চশমার ফাঁক দিয়ে সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল –মিসেস উইন্টার্স মোরানোতে কাঁচের কারখানা দেখবেন। সেই কাজেই ব্যস্ত ছিলাম।

আপনিও যাবেন তো?–অনুরোধের সুরে শুধোলাম।

না আমি যাবনা, অন্য কাজ আছে। বলেই ডালান যাবার জন্য পা বাড়াতে আমি তার হাতখানা ধরে ফেললাম।

এক ঝটকায় সে আমার হাতখানা ছাড়িয়ে নিল। আমার দিকে একধরনের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তার এই ধরনের দৃষ্টির অর্থ আমি, বুঝি। এটা সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণের ইঙ্গিত। আমিও পথ আগলে দাঁড়িয়ে রইলাম।

আমার বেশী কাছে আসবার চেষ্টা করবেন না, মিঃ উইন্টার্স। কথাগুলো বলে সেগটগট করে লাউঞ্জে ফিরে গেল।

আমি তখন হতাশ হলেও অবাক হলাম না, কেবল সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকলাম খেলিয়ে দেখবার জন্য। কিন্তু শরীরের কামনার আগুন যেন দাউদাউ করে জ্বলে উঠল।

আমি কেবিনে ঢোকামাত্রই ভেস্তাল আমার দিকে এগিয়ে এসে বলল–শেড ডার্লিং!বিকালে আমাদের সঙ্গে গন্ডোলায় ইভকে নিয়ে যাব? অবশ্য যদি তুমি বল।

ভেস্তালের কথা শুনে আনন্দ হলেও নিস্পৃহ গলায় বললাম তোমার ইচ্ছেতেই আমার ইচ্ছা। আমার আপত্তি করবার কিছু নেই। বলে ওর হাত মৃদু চেপে ধরলাম। ভেস্তাল খুশী হল।

ডিনারের পর আমরা খেয়া ঘাটে চলে এলাম। সেখানে ইভ ডোলান অপেক্ষা করছিল। একটা কেবিনওলা গন্ডোলা নিয়ে আমরা লিভোর দিকে এগোেলাম। ভেস্তাল এক একটা দৃশ্য দেখছে আর বকবক করে যাচ্ছে সমানে। আর আমি সেদিনকার ইভেরনঃশরীরের উষ্ণ স্পর্শের স্মৃতিটা মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করছিলাম।

যা ভেপোরত্তি স্টেশনে গন্ডোলা ছেড়ে দিয়ে মোটর করে একটা হোটেলে চলে এলাম। ভেস্তালের আবদারে তার সঙ্গে নাচতে হল।ইভ একটা টেবিলে বসে আমাদেরকে দেখতে থাকে।

আধঘণ্টা পরে ভেস্তাল আর আমি টেবিলে এসে বসলাম। ভেস্তাল ইভকে আমার সঙ্গেনাচবার জন্য অনুরোধ করল অবশ্য অনেকটা দয়া করে।

ভেস্তালের অনুরোধে ইভ চমকে উঠে বলল–অনেক ধন্যবাদ, মিসেস উইন্টার্স। আমার নাচতে ভাল লাগছে না। বরং আপনাদের নাচ দেখতে ভাল লাগছে।

আমার কিন্তু এই সুরটা খুব ভাল লাগছে। এস ডার্লিং, আমরা তাহলে নাচি,–আবদারের সুরে বলল ভেস্তাল।

অগত্যা তার সঙ্গে ফ্লোরে গিয়ে নাচতে হল। মাঝরাত পর্যন্ত ভেস্তালের সঙ্গে নাচতে হল। আমরা ফিরে এলাম। ডোলানও নিজের ঘরে ফিরে এল।

ভেস্তাল আমার সামনে পোক ছাড়বার সময়ইভ সম্পর্কে নানান কথাবলতে লাগল। ভেস্তাল ইভের প্রশংসা করল। কথাপ্রসঙ্গে তার কাছ থেকে জানতে পারলাম ভেস্তাল ইভ

বা অর্গিসকে আটকে রাখার জন্য তাদের জন্য কিছু সম্পত্তি উইল করে রেখেছে। আমি তার কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লাম। এরই মধ্যে উইল। সাত কোটি ডলার থেকে আবার চাকর চাকরানীদের ভাগ।

আমি ভেস্তালকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম কয়েকশো ডলার রয়েছে ওদের জন্য।

রাত্তিরে দুজনে আমরা পাশাপাশি শুয়ে আছি। আমার মাথায় চিন্তা কি করে সাত কোটি ডলার পুরোপুরি হাতিয়ে নেওয়া যায়। আমার হঠাৎ খেয়াল হল–ভেস্তাল হঠাৎ যদি মারা যায়! আচ্ছা, ও যদি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে! এমনও তো হতে পারে ভেস্তাল পথে দুর্ঘটনার শিকার হতে পারে! তাহলে আমি সাত কোটি ডলার বিনা বাধায় পেয়ে যাব। কিন্তু মিঃ অ্যাটর্নী সাহেব,আপনি ভাববেন না যে আমি ওকে খুন করবার মতলব আঁটছি।

এরপর মোরানোতে কাঁচের কারখানা দেখতে গিয়ে প্রচণ্ড গরমে ভেস্তাল নিস্তেজ হয়ে পড়ে। আমি স্নান সেরে ভেস্তালের কাছে গিয়ে একটু বাইরে গিয়ে গলা ভিজিয়ে আসবার অনুমতি চাইলাম।

ভেস্তাল অনুমতি দিল, বলল তার মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা। কয়েকটা ভেজলিন খেয়েছে।

তাকে শুতে বলে আমি দরজা বন্ধ করে সোজা চলে এলাম ইভের ঘরে। তার দরজায় এসে নক করতে সে কটমট করে আমার দিকে এমন ভাবে তাকাল যে গালাগালি দিতে ইচ্ছা করছিল।

নিজেকে সংযত করে নিয়ে বললাম–মিসেস উইন্টার্সের মাথায় খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। দেখুন আপনি কি করতে পারেন।

ইভ বলল–আমি এখনই যাচ্ছি।

দেখুন। ও হয়ত একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়বে। আপনি আজ নটা নাগাদ সানমার্কের সামনে দেখা করবেন?

পারব বলে মনে হয় না–কথাটা বলে সে দ্রুতগতিতে ভেস্তালের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল পাছায় মারাত্মক একটা ঢেউ তুলে।

সানমার্কোর সামনে অপেক্ষা করছি ডোলানের জন্য। আমি জানতাম যে সে আসবেই কারণ দুজনের লক্ষ্য একই। এইসব কথা ভাবছি এমন সময় একটা মেয়ে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। তার পরনে সুন্দর সান্ধ্য পোক।পোষাকের সরু ফিতেটা যেন যৌবনকে ধরে রাখতে পারছেনা। মুখ ঘুরিয়ে তার দিকে চেয়ে দেখলামকালো চশমা পরিহিত মেয়েটি ইভ ছাড়া আর কেউ নয়।

আমি তার উদ্দেশ্যে বললাম–ওহ্ ইভ। তোমাকে একদম চিনতে পারিনি।

ইভ কথার উত্তর না দিয়ে বলল–এখানে নিরাপদ নয়, আমরা ঐ গন্ডোলাতে গিয়ে উঠব।

ইভ কথাগুলো বলে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়ল গন্ডোলার একটা কেবিনে। কেবিনের পাটাতনের উপর গদী মোড়া। ইভ তো সটান চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। আমি হাঁটু

মুড়ে তার পাশে গিয়ে বসলাম। ওর পুরুষ্টু উরুর উপর হাত বোলাতে বোলাতে বললাম–তোমাকে যেদিন সাঁতারের পোষাকে দেখি সেদিন থেকেই

আমার সব কথা শেষ করতে না দিয়ে ইভ আমাকে বুকের উপর টেনে নিল। মুহূর্তের মধ্যে শরীরের যত কামনা সব উজাড় করে ইভেরতুলতুলে শরীরে ঢেলে দিলাম। তারপর দুজন দুজনকে আঁকড়ে ধরলাম।

কিছুক্ষণ ঐরকম ভাবে থাকবার পর ইভ বলল–সাড়েনটা বেজে গেছে। এবার আমাকে যেতে হবে।

আমি প্রতিবাদ করে উঠলাম–এত তাড়াতাড়ি ফেরবার কি দরকার আছে?

ইভ জবাব দিল–তোমার চেয়ে আমি ভেস্তালকে বেশী চিনি। একঘণ্টা পরে যখন ঘুম ভাঙবে, তখন আমাকে ডেকে পাঠাবে।

আমি অধৈর্য স্বরে বললাম–আমার অনেক দরকার আছে। কিছু কথা

আমাকে থামিয়ে ইভ বলল কথা বলার কিছু নেই, কেবলমাত্র চুরি করে একটু আধটু প্রেম বা দেহমিলন হতে পারে। তার বেশী নয়। নিশ্চয়ই ভেস্তালের কাছে ধরা পড়তে চাও না?–কথাগুলো বেশ খোঁচা মেরে বলল।

আর তখনি আমার মাথার মধ্যে সাত কোটি ডলারের চিন্তাটা পাক খেল। আমি মাথা নেড়ে বললামনা, না, মোটেই নয়।

ইভ সঙ্গে সঙ্গে বলল–আমিও চাই না। তোমার হঠকারিতার জন্য আমার এই চাকরীটা খোয়াতে।

আমি ইভের চোখে চোখ রেখে বললাম–তোমার জন্য আমি পাগল হয়ে গেছি। তোমাকে চাই আমার।

ইভ আমার দিকে একদৃষ্টেপলকখানেক তাকিয়ে রইল। তারপর বলল–আমিও তোমার জন্য পাগল হতে চলেছি। তবে আর একটা সুযোগ করে নেবার সময় দেবে তো? অযথা কোন ঝুঁকি আমি নিতে চাই না।

আমিই তো তোমাকে সুযোগটা করে দিলাম।

মোটেও না। খোকনসোনা!বলে ইভ আলতো করে মুখ তুলে আমার ঠোঁটে চুম্বন করে মুচকি হেসে বলল–মাথা ধরাটা দিল কে? মাথা না ধরলে তুমি সুযোগ পেতে কি?

তার কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম। একটা ঠাণ্ডা স্রোত আমার শিরদাঁড়া বেয়ে নিচে নেমে গেল। প্রশ্ন করলাম–তোমার এ কথা বলার মানে?

ইভ মুচকি হেসে বলল–ভেস্তালকে যখন আমি একদম সহ্য করতে পারি না, তখনই একটা পি খাইয়ে দিই খাবারের সঙ্গে।

আমি চমকে উঠে বলি–তার মানে?

ইভ বলল–এতে ভয় পাবার কিছু নেই। মারা যাবার ভয় নেই, আমার এক ডাক্তার বন্ধুর কাছে জেনেছি।

আমার ব্যাপারটা খুব ভাল লাগল না। বললাম–ওষুধপত্র নিয়ে এইভাবে খেলা করাটা বিপদজনক।

ইভের দিকে তাকিয়ে বললাম তুমি ভেস্তালকে ঘৃণা কর! তাই না ইভ?

ইভ দৃঢ় গলায় জবাব দিল–তোমার চেয়েও বেশী।

সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রশ্ন করি–তুমি তাহলে এখানে চাকরী করছ কেন?

ইভ পাল্টা প্রশ্ন ছোঁড়ে–তুমি ওকে বিয়ে করেছ কেন?

আমি বললাম আমার ব্যাপারটা আলাদা।

মোটেই আলাদা নয়। তুমি টাকার জন্যে ওকে বিয়ে করেছ। আর আমি চাকরী করছি বিলাসিতার মধ্যে জীবন কাটাতে পারব বলে। তারপর ইভ আদুরে গলায় মিনতি জানিয়ে বলল–একটা চুমু দাও, আমাকে শেড।

আমার মনে হল সত্যিই যেন আমি প্রথমবার একটা মেয়ের প্রেমে পড়লাম। তার শরীরের সঙ্গে নিজের শরীরটা লেপ্টে দিয়ে ওর মুখের উপর মুখ দিয়ে পড়ে রইলাম।

কিছুক্ষণ এরকমভাবে থাকার পর ডোলান আমাকে ঠেলে উঠেবসল–শেড, এবার আমি যাই। আমি ভেস্তালকে চিনি, সে যদি ঘুম ভেঙ্গে আমাকে না পায় তাহলে আমার চাকরীটা যাবে। ভেস্তাল খুবই সন্দেহ ও ঈর্ষা পরায়ণ। ঐ মহিলার কাছে কিছুই চাপা থাকে না।

ফ্লিকসাইডে ফিরে গেলে বোধহয় ব্যাপারটা অনেক সোজা হয়ে যাবে বললাম আমি।

তা মোটেই হবে না। ইভ বলল–সেখানে দিনের বেলায় প্রতিটা দিন আমাকে তার কাছে থাকতে হবে এবং রাত হলে তোমাকে চাইবে। আমাদের গোপন যোগাযোগ কখনই সম্ভবপর হবে না।

আমি সান্ত্বনার সুরে বললাম–ওরই মধ্যে আমরা একটা সুযোগ করে নেব।

সেটা যেন পুরোপুরি নিরাপদ হয়, ঝুঁকি নিতে চাই না। কথা বলতে বলতে গন্ডোলাটা পাড়ে এসে ঠেকল।

ইভ আমার ঠোঁটে একটা চুম্বন দিয়ে বলল–আমি আগে যাচ্ছি, তুমি কয়েক মিনিট পরে এস।

তার কথা শুনে একবুক আশায় রইলাম। ভেস্তাল নিশ্চয় খুব শিগগীর মারা যবে।ইভই হয়তো, ওকে ওষুধ খাইয়ে মেরে ফেলবে, আর তখনই আমি ইভকে জীবনসঙ্গী হিসাবে পাব আর সাত কোটি ডলারের মালিক হয়ে যাব।

.

০৯.

কয়েক সপ্তাহ পার হয়ে গেল কিন্তু ইভকে আর কাছে পাচ্ছি না। মধুর দিনটার কথা ভেবে আমি প্রায় পাগল হয়ে যেতে বসেছিলাম। শেষে একদিন থাকতে না পেরে স্নানের ঘর থেকেই ইভকে ফোন করলাম। জলের কলগুলো আগে ফুল ফোর্সে ছেড়ে দিয়ে অপারেটারের কাছে ইভের নম্বর চাইলাম। আমি তখন ভাবছি পাশের ঘরেই তো ভেস্তাল আছে, আর তার পাশেই ফোন আছে। সে যদি আমাদের কথা শুনতে পায়। যা ফোনের অপর প্রান্ত থেকে ডোলানের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।–হ্যালো! কে বলছেন?

ইভ আজ রাতে তোমাকে একটা বন্দোবস্ত করতে হবে। আর পারা যাচ্ছে না–ক্লিক শব্দ করে ওপাশে ফোন রেখে দিল ইভ। আর ফোনে ভেস্তালের কণ্ঠস্বর শুনলাম–তুমিই ফোন করেছিলে শেড।

আমার তখনি মনে হচ্ছিল ভেস্তালের গলাটা যেন চেপে ধরি।রাগ সামলে নিয়ে বললাম হ্যাঁ, আমি।

অবাক হয়ে সে প্রশ্ন করল–কেন?

আমি রিসিভার নামিয়ে রেখে স্নান সেরে ভেস্তালের ঘরে যেতে সেই এক প্রশ্ন, চোখে–মুখে সন্দেহের ছাপ সুস্পষ্ট।

আমি শুকনো হাসি হেসে বললাম–তোমাকে একটা সারপ্রাইজ দেব বলে, তাতেও ভেস্তাল ক্ষান্ত হয় না, প্রশ্ন করল–তাহলে ইভ রেখে দিল কেন?

ও রাখল কোথায়। তুমিই তো ফোনটা কেটে দিলে। একটু থেমে বললাম যে, লিডোতে সাঁতার কাটতে যাব বলে মিস ডোলানকে একটা মোটরের বন্দোবস্ত করবার কথা বলতে যাচ্ছিলাম।

ভেস্তালের তাতেও অবিশ্বাস। সে বলল–মিস ডোলনকে যা বলার দরকার তা আমিই বলে দেব।

ঠিক আছে, বলে আমি দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। আমি এই ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলাম যে, সে শুনেছে যখন কিছু একটা ব্যবস্থা করে থাকবে।

ঠিক তাই, ডিনার খাওয়ার পর ভেস্তাল অসুস্থ হয়ে পড়ল। বিছানায় সে দুহাতে মাথা টিপে বসে রইল। আমাকে বাইরে ঘুরে আসতে বলল আর ইভকে এখনি পাঠিয়ে দেবার জন্য বলল।

আমি কিছুটা ভনিতা করে বললাম–সকালে রোদে বসতে বারণ করেছিলাম তো সে কথা তুমি শুনলে না।

আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম সোজা ইভের ঘরে। ইভের ঘরের দরজায় এসে টোকা মেরে ঢুকে পড়লাম, ইভ ঘরেতেই ছিল। ওর সুডৌল স্তন দুটো, নিটোল পাছা, আমার দুহাতে ছেনে, চটকে ওকে পাগল করে তুললাম। ইভ ওর ঠোঁট দিয়ে আমার ঠোঁট চেপে ধরল–এভাবে সাক্ষাৎ হওয়া আমাদের পক্ষে

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে বললাম–ওর মাথা ধরেছে, তোমাকে এখনি ডাকছে।

ইভ মৃদু হেসে বলল–ও কিছু না, দুটো ভেজলিন বড়ি খাইয়ে দিলে ঘুমিয়ে পড়বে। আর তার পরেই আমি তোমার কাছে চলে যাব। সানমার্কের সামনে অপেক্ষা করো, কেমন?

আমি বললাম–তোমাকে না পেলে আমি পাগল হয়ে যাব।

আমিও, তবে সাবধানে সবকিছুবলে ইভ দ্রুত পায়ে ভেস্তালের ঘরের দিকে চলে গেল।

আমি দুটো ডবল হুইস্কি খেয়ে লাউঞ্জে অনেকক্ষণ ঘোরাফেরা করবার পর সানমাকোর খেয়াঘাটের সামনে এসে সেদিনকার সেই মাঝিটাকে গণ্ডোলা ঘাটে লাগাবার নির্দেশ দিলাম। সে আমাকে দেখেই স্যালুট করল। সেখানে অপেক্ষা করছি ইভের জন্য কিন্তু কোথায় ইভ! শেষে ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে মাঝির পয়সা মিটিয়ে দিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে পা বাড়ালাম।রাগে আমার সারা শরীর রি–রি করে কাঁপছিল।

ভেস্তালের ঘরে সোজা চলে এলাম। দেখলাম, ভেস্তাল শুয়ে আছে। ল্যাভেন্ডার জলে ভেজানো কাপড়ের টুকরো রয়েছে ওর কপালে। পাশে ইভ বসে আছে। ও কবিতা পড়ে শোনাচ্ছে। শেড লাইটে আমার ক্রুদ্ধ মেজাজটা, মুখ দেখে কেউ আন্দাজ করতে পারবে না।

ভেস্তাল আমার পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাইভও ফ্যাকাশে দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল।

শেড এলে বুঝি?–ভেস্তালের গলার সুর খুব নরম শোনাল।

হ্যাঁ, আমি। তুমি এখন কেমন বোধ করছ?

একটু ভাল। ওষুধে মাথার যন্ত্রণাটা একটু গেছে।

আমি ভেস্তালকে ঘুমোবার জন্য লাম।

এবার মিউমিউ করে ভেস্তাল বলল–শেড ডার্লিং, আজ তুমি পাশের ঘরে শোবে? ইভ আজ আমার কাছে রাত্তিরটা থাকবে তাহলে। তুমি রাগ করবে না তো?

আমি আনন্দে উত্তেজনা বোধ করলাম। তাহলে ইভকে তো সারা রাত্তিরটা পাওয়া যাবে।

আমি বলে উঠলাম–না, না,রাগ করব কেন? তুমি বরং ঘুমোবার চেষ্টা কর। দশটা বেজে গেছে।

ভেস্তাল আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল–জানতাম, তুমি অবুঝ নও।

এভাবে চারটে দিন কাটল ভেস্তালের সামনে নিজেকে সামলে রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা। অসহ্য লাগছে যেন সবকিছু। সেদিন রাতে ডিনার খেতে যাব বলে স্নান সেরে পোষাক পরে তৈরী হয়ে নিলাম। ভেস্তাল এখনও তৈরী হয়নি। আমাকে দেখে বলল–ও বাবা, তোমার এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল।

আমি আদুরে গলায় বললাম তুমি তো একটা আলসে মেয়ে। তারপর তাড়াতাড়ি ভেস্তালকে নীচে আসতে বলে আমি তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

বারান্দা পেরিয়ে সোজা ইভের ঘরে ঢুকলাম।নীল রং–এর ছোট টাইট প্যান্ট দুই পুরুষ্টুউরুতে কামড়ে ধরেছে, বুক দুটো এক ফালি কাপড় দিয়ে বাঁধা। আয়নার সামনেদাঁড়িয়ে ইভ মোজা পরছে।

আমাকে দেখে সে অবাক হল, ক্রুদ্ধও হল। গর্জন করে উঠল–শেড, তুমি এখানে এসেছ কেন? ভেস্তাল জেনে যাবে।

কালকে ওকে ওষুধ খাওয়াবে। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না।মিনতির স্বরে বললাম।

কোন লাভ হবে না তাতেই বলল–অসুখ করলে আমাকে তার কাছে থাকতে হবে। কাজেই কি লাভ।

আমি ইভের তুলতুলে নরম শরীরটা জড়িয়ে ধরে ওর দেহের উত্তাপ আমার নিজের দেহের মধ্যে টেনে আনলাম।

তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি–ইভ উত্তেজিত গলায় দ্রুত বলে গেল। বলেছি না, তোমার জন্য আমি চাকরিটা খোয়াতে পারব না।

এমন সময় দরজায় কে নক করল।

দুজনের দেহের রক্ত হিম হয়ে গেল। ইভ তড়িতে আমার হাত ধরেই একটানে আধখোলা জানলার ভারী পর্দার আড়ালে ঢুকিয়ে দিল আমাকে। তারপর দ্রুত স্বস্থানে ফিরে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

ভেস্তাল এসেছে। প্রশ্ন করল–কারোর সঙ্গে কথা বলছিলে মনে হল?

–হ্যাঁ ম্যাডাম, আমি গুণ গুণ করে গান গাইছিলাম।–ইভের গলার স্বর অতিশয় শান্ত।

ভেস্তাল তার কাছে সেন্ট চাইল, ছুতো দেখাল তার শিশিটা ভেঙ্গে গেছে!

ইভ জড়তাহীনভাবে বলল নিশ্চয়ই! আপনি পুরোটাই নিয়ে যান।

ভেস্তাল চলে গেল। ওদিকে পর্দার আড়ালে দেওয়ালের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে আছি। শরীর গড়িয়ে ঠাণ্ডা ঘামের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। হাত–পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। চরম বোকামীর জন্য নিজেকে গালাগালি দিতে ইচ্ছে করছে। ব্রা আর প্যান্টি পরে রয়েছে ইভ। ভেস্তাল বোধহয় গন্ধ পায়। সন্দেহের কারণ হয়েছি আমি। ইভকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্য একটা অজুহাত নিয়ে এসেছে।

দরজা বন্ধ করেইভ এসে দ্রুত পদাটা এক টানে সরিয়ে দিয়ে গর্জন করে বলে উঠল–বেরোও। দূর হয়ে যাও আমার ঘর থেকে। আজই আমাদের সব সম্পর্ক শেষ।

কিন্তু ততক্ষণে নড়বার ক্ষমতা আমি হারিয়ে ফেলেছি। বুক ধড়ফড় করছে। তবুও বললাম একটা রাস্তা খুঁজে আমি বার করব।

আর কোন রাস্তা নেই–ইভ চাপা স্বরে বলল। তারপর ইভ উঁকি মেরে একবার দেখে নিল বাইরে কেউ আছে কি না।

তারপর চোরের মত তার ঘর থেকে সন্ত্রস্তভাবে বেরিয়ে বারান্দা দিয়ে হেঁটে লাউঞ্জে ফিরে এলাম।

আজ নিজের বোকামীর জন্য সাত কোটি ডলার হাতছাড়া করতে বসেছিলাম। মাথায় চিন্তার জট পাকাতে থাকে। একদিকে টাকা অপরদিকে ডোলান।

অস্থিরতার মধ্যে দিনগুলো কাটছিল। শেষ পর্যন্ত ভেস্তালই বাড়ি ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিল। ভেনিসে তিন সপ্তাহ কাটানো হল, তারপর বিমানে লসএঞ্জেলস্ আর সেখান থেকে মোটরে করে লিটল ইডেনে। এর মধ্যে মনে মনে পরিকল্পনা করে নিয়েছিলাম ইভের সঙ্গে আমার দেখা করবার জন্য একটা আলাদা ঘর নিতে হবে। আমি নিজে সব সময় কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকব।

বাড়িতে ফিরে ভেস্তাল এক গাদা চিঠিপত্র নিয়ে বসল। আমি রায়ান ব্ল্যাকস্টেনকে ফোন করলাম। কাজকর্ম করবার সঙ্গে সঙ্গে লাভের অঙ্কটাও বেড়ে চলেছে।

কিন্তু ইভের সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ হয়ে উঠছে না।

ভেস্তাল আমার ঘরে এসে বলল–শেড ডার্লিং, আমাকে সানফ্রান্সিসকোতে যেতে হবে।

তাকে জিজ্ঞাসা করাতে জানতে পারলাম–পরশুদিন একটা পুরোনো স্কুলে একটা হলের উদ্বোধন করতে হবে। হলটির নাম শেলী লেকচার হল। মিঃ শেলী এটা তৈরী করবার জন্য টাকা দিয়েছিল। প্লেনযোগে সেখানে যাবে, তিনদিন থাকতে হবে।

ভেস্তাল তার সঙ্গে যাবার জন্য আমাকে অনুরোধ করল কিন্তু আমি কাজের ব্যস্ততা দেখিয়ে। তার হাত থেকে রেহাই পাবার চেষ্টা করলাম।

ভেস্তাল জানাল, তাহলে সে ইভকে সঙ্গে নিয়ে যাবে একাকীত্ব ঘোচাবার জন্য।

তার কথা শুনে মনে হল একটা চড় মারি।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত ইভের যাওয়া হল না। যাবার দিনে সে ভীষণ অসুস্থ, প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। আমি বেশ খুশী হলাম। ভেস্তালকে বললাম–তোমার খাস চাকরানীকেই নিয়ে যাও। কি করবে, বেচারী অসুস্থ হয়ে পড়ল।

ভেস্তাল নিরুপায় হয়ে তার খাস চাকরানী মারিয়ানাকে নিয়ে সানফ্রান্সিসকোর উদ্দেশ্য রওনা হল।

আমি ভেস্তালকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিলাম। ঠাট্টা করে বলল–দেখ আমার অনুপস্থিতির সুযোগে যেন কুকর্ম করে বসো না।

সরলভাবে বলে দিলাম–আজ ব্ল্যাকস্টেনের সঙ্গে ডিনার খাব, আগামীকাল স্টার্টউডের সঙ্গে। ব্যঙ্গের সুরে বললাম–এদের সঙ্গে কি কুকর্ম করব বল?

ভেস্তাল আমাকে চিমটি কেটে বলল–ইভ রয়েছে যে?

আমি সঙ্গে সঙ্গে ঠাট্টা করে বললাম–অতগুলো চাকরবাকর বিশেষ করে অর্গিসের চোখ এড়িয়ে ইভের সঙ্গে কি করতে পারি?

ভেস্তাল আমার গলা জড়িয়ে ধরে চুম্বন করল। পেটের মধ্যে পাক দিয়ে উঠল। সারা শরীরের মধ্যে রি-রি করে উঠল। সব লোক ভাবছে টাকার লোভে এরকম একটা কুৎসিত বাঁদরকে আমার মত এক যুবক বিয়ে করেছে।

ভেস্তাল ন্যাকামির গলায় বলল–আমার যেতে ইচ্ছা করছে না শেড তোমাকে ফেলে।

আমি ভেস্তালকে একরকম জোর করেই প্লেনে উঠিয়ে দিলাম। যতক্ষণ দেখা গেল, ততক্ষণ হাত নাড়ল ভেস্তাল।

তারপর আমি বাড়ি ফিরে এলাম। অর্গিসের কাছ থেকে ইভের খবর নিয়ে জানতে পারলাম সে এখনও অসুস্থ। নিজের ঘরেই শুয়ে রয়েছে।

আমি পড়বার ঘরে গিয়ে রিসিভার তুলে ইভের ফোন নম্বর ডায়াল করলাম। ফোনে ওর গলা শুনতে পেয়েই ওকে বারোটার সময় আমার ঘরে আসবার জন্যে বললাম।

বারোটার সময় ইভ আমার ঘরে এসে হাজির হল। দুঘণ্টা ধরে ইভের নরম তুলতুলে দেহটা উল্টে-পাল্টে ছেনেও তৃপ্তি পাচ্ছি না। তার দেহটা বুকে আঁকড়ে ধরে শুয়ে

থাকলাম। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকবার পর ইভকে আদুরে গলায় জিজ্ঞাসা করলাম–আমরা কবে আবার মিলিত হতে । পারব?

যতটুকু পাচ্ছ, তাতেই সন্তুষ্ট থাক। ইভ বলল–জেনে রাখ, আমরা মোটেই নিরাপদ নয়। বেশী বাড়াবাড়ি করলে যে কোন মুহূর্তে আমরা ধরা পড়ে যেতে পারি।

একটু থেমে সে আবার বলল–এই মুহূর্তে মিসেস উইন্টাস শেলী এসে দরজায় টোকা দিলেও আমি আশ্চর্য হব না। তিনি হয়তো আদৌ সানফ্রান্সিসকো যাননি।

আমি অনুরোধের সুরে বললাম–তাই বলে তোমার জন্য এখন ছ সপ্তাহ অপেক্ষা করে থাকব সুযোগের অপেক্ষায়!

আমি তাকে প্রস্তাব দিলাম–সপ্তাহে যে দিন সে ছুটি পাবে, সেদিন আমাদের যাতে গোপন সাক্ষাৎ সম্ভব হয়, তার জন্য একটা আলাদা ঘর নেব। কেউ জানতেও পারবে না।

আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। ইভ সঙ্গে সঙ্গে বললনা। ঐ ছুটির দিন আমি মায়ের কাছে যাই। ঐদিন না গেলে মিসেস উইন্টার্স মা ফোন করে জানতে চাইবে আমার কথা। শেষে হিতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে।

তখন আমি তাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব দিলাম। বললাম–আমার তিরিশ হাজার ডলার ব্যাঙ্কে রয়েছে তাই দিয়ে ব্যবসা করে মুনাফার অঙ্ক বাড়িয়ে নেব, আমাদের দুজনের চলে যাবে।

তাকে আরও বললাম–ভেন্তাল যাতে আমাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, সে ব্যবস্থা আমি করব।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ইভ দৃঢ়স্বরে জানাল–আমি নাকি পাগল হয়ে গেছি। তিরিশ হাজার ডলার নিয়ে আমাদের দুজনের সুখে আর কতদিন কাটবে? সে এই চাকরী ছাড়তে পারবে না।

আমি তাকে খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম–এই চাকরীতে তুমি কি মজা পাও?

সে জানাল–এত বড় বাড়িতে সুখে থাকতে পাচ্ছে, খেতে পাচ্ছে। নিজস্ব গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়াতে পারছে। এটা তার কাছে অনেক আরামদায়ক।

আমি তাকে সাজগোজ ও পোষাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে বললে সে বলল–মেয়েদের মনস্তত্ব অনুযায়ী কোন মেয়ে তাদের থেকে সুন্দরীকে মোটেও সহ্য করতে পারে না। সেজন্য মিসেস উইন্টার্স–এর কুৎসিত চেহারার সামনে নিজেকে সব সময় সজ্জিত করে থাকলে যে কোন মুহূর্তে চাকরী চলে যেতে পারে। তাকে অনেকে এ বিষয়ে মন্তব্য করেছিল, কিন্তু চাকরী চলে যাবার ভয়ে সে তাতে গুরুত্ব দেয় না। সে আরও জানায় তার আগে কোন সেক্রেটারী এই কারণে টিকে থাকতে পারে নি। তার কারণই এই রূপ। তাই সে তার রূপ জাহির করে এই বিলাসিতাটুকু ছাড়তে পারবে না।

মিথ্যে কথা। আমি প্রতিবাদ করে বলে উঠলাম–ভেন্তাল উইলে তোমার নামে টাকা রেখেছে তাই তুমি এই চাকরীটা ছাড়তে চাইছ না।

ইভ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল–সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

আমি ঠাট্টার সঙ্গে জবাব দিলাম কিন্তু ইভ, তুমি শেষে ঠকে যাবে। ভেস্তাল তোমার জন্য মাত্র কয়েক শ ডলার রেখেছে।

মোটেও না।ইভ প্রতিবাদ করে বলে উঠল কদিন আগে ভেস্তালনতুন উইল করেছেঅ্যাটর্নী ডেকে। ইভ আমার দিকে তাকিয়ে খানিকটা চ্যালেঞ্জের সুরে বলল–আমার নামে রয়েছে পঞ্চাশ হাজার ডলার। কাজেই বুঝতে পারছ, তোমাকে ছাড়ব তবু এই চাকরী আমি ছাড়ব না।

আমি বোকার মত চুপসে গেলাম। ইভ বলতে থাকে আর আমি এও জানি, তোমার নামে রয়েছে কোটি ডলার আর সম্পত্তির সবটুকু। তারপরেই ব্যঙ্গের সুরে বলল–তুমি কি ভেস্তালকে এখনও ত্যাগ করতে চাইবে?

না, এখন অবশ্য অন্যরকম ভাবতে হবে।

আমি বিছানা ছেড়ে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগলাম, কিন্তু টাকার আশায় থাকলে তো বুড়ো হয়ে যাবো। কতদিন এভাবে অপেক্ষা করতে হবে? আর টাকা পেয়ে ভোগই বা করব কবে? মরেও তো যেতে পারি!

অন্যমনস্কভাবে আমার মুখ থেকে কথাগুলো বেরিয়ে এল। ইভ বলল–সময়টা কমিয়ে আনবার আশায় থাকতে হবে।

আমি বললাম কবে কোন্ দুর্ঘটনায় মারা যাবে বা কঠিন অসুখ হবে, এ রকম আশা করে বসে থাকা যায় নাকি?

আমাদের আর কোন উপায় নেই। আমাদের ভবিষ্যতের আলোচনাকে স্তব্ধ করতে হল দেহের মধ্যে শীতল শিহরণ বয়ে নিয়ে যাওয়া টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং শব্দে। মনে হল যেন আচমকা কোন লোক ঘরে ঢুকে পড়েছে। ভীষণ বিরক্ত হয়ে দাঁত চেপে গর্জন করে বলে উঠলাম রাত দুটোর সময় ফোন? ফাজলামো? ওদিকে ইভ জামাটা তুলে নিয়ে ওর নগ্ন শরীর দুহাতে চেপে ধরল। তারপর দরজার কাছে চলে গিয়ে দুটো পা দিয়ে প্যান্টিটা কোমরে টেনে তুলে নিল।

যাক রিসিভার তুলে ফোনে কান পাততেই শুনতে পেলাম ভেস্তালের গলা। পেত্নীটা তিনশ মাইল দূরে থেকেও আমার ও ইভের মাঝে একটা ব্যবধান গড়ে তুলতে চাইছে। ফোনে সে জানতে চাইল–আমি ঘুমোচ্ছিলাম কিনা?

ঘুম জড়ানো গলায় উত্তর দিলাম–তুমিই তো ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলে। আমি তাকে বললাম তুমি এখন ঘুমিয়ে পড়। অনেক রাত হয়েছে। লক্ষ্মী মেয়ে–আদুরে সুরেতে বললাম।

ও আমার কথায় গুরুত্ব না দিয়ে বলতে থাকে, ও একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছে আর সেটা আমাকে বলবার জন্যই, আমি ভাল আছি কিনা তা জানবার জন্যই আমাকে ফোন করেছে। স্বপ্নটা এরকম–আমি ভেস্তালের থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছি। সে ধরতে যাচ্ছে, কিন্তু আমি ছুটে পালাচ্ছি। এক সময় আমি নাকি উধাও হয়ে গেছি। আমি যদি তাকে ছেড়ে দিই এই ভয়ে সে সর্বদা কুঁকড়ে রয়েছে। ফোনে আমাকে আদর করবার

মতই বলতে থাকে–তোমাকে আমি ভীষণ ভালবাসি। শেড তোমার গলা শুনে প্রাণ পেলাম।

এরকম আরও কত কথা। শুনতে শুনতে বিরক্তিতে আমার সারা শরীর রি–রি করতে থাকে। আমি ফোনের লাইন রেখে দেবার জন্য তাকে শুয়ে পড়বার কথা বললাম। কিন্তু সেখানে ও কি বক্তৃতা দিয়েছে, কি করেছে, না করেছে কত কথা একসঙ্গে বলে গেল। আমি তার সবটা শুনিই নি। একসময়ে প্রায় জোর করেই তাকে ফোন রাখবার নির্দেশ দিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখলাম। ইভ ততক্ষণে পোষাক পরে নিজেকে আচ্ছাদিত করে নিয়েছে। আমি তার কাছে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম।

ইভ বলল–তার আজ আর ভাল লাগছেনা। মনেহচ্ছে ঘরের মধ্যে কোন লোক ঢুকে রয়েছে।

আমি তার কাছে কথা চেয়ে নিলাম–আগামীকাল তাকে আমি আবার পাব কিনা।

ইভ মৃদু হেসে জবাব দিলকালকে আমাদের মিলন সম্ভব নয়। কেননা ভেস্তাল কালকেই চলে আসবে।

প্রতিবাদ করে বলে উঠলাম–কখনই হতে পারেনা।কাল ওকে পুরস্কার বিতরণ করতে হবে।

ইভ হেসে বলল–আমি তোমার থেকে মিসেস উইন্টার্সকে বেশী চিনি।

শেষ পর্যন্ত ইভের অনুমান ঠিক হল। অফিস থেকে পরের দিন বাড়ি ফিরে দেখলাম ভেস্তাল এসে গেছে। রাগে আমার মাথা গরম হয়ে গেল। আবার সেই নরকযন্ত্রণার মধ্য দিয়ে দিন তিনেক কাটবার পর ঘটল একটা বিশ্রী ঘটনা।

সেদিন ভেস্তাল আমার কাছে এসে জানতে চাইল–আগামীকাল সে একটা পার্টি দেবে, আমি তাতে থাকতে পারব কিনা? আমি তখন শোবার ঘরে বসে শেয়ার বাজারের কিছু কাগজপত্র দেখছিলাম।

আমি কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বললাম–হ্যাঁ, থাকব। কিন্তু তুমি এখন এখান থেকে যাও তো সোনা।

ভেস্তাল চলে গেল। ভয় লাগে সে যদি আমার মনোভাব বুঝতে পারে। আমি দু পেগ হুইস্কি গলাধঃকরণ করে সতর্কভাবে ইভের অফিস ঘরে চলে গেলাম।

আমি তাকে বললাম–আগামীকাল আমাদের দেখা হচ্ছে তো?

না, কাল মায়ের কাছে যেতে হবে–জবাব দিয়ে সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে ওর হাতটা ধরে ফেললাম।

ও এক ঝটকায় আমার হাত ছাড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দরজার দিকে মুখ ঘোরাতেই দেখি দরজার সামনে অর্গিস দাঁড়িয়ে আছে।

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম–এখানে কি চাই?

অর্গিস একটুও বিচলিত না হয়ে জবাব দিল মিস ডোলান আমাকে আসতে বলেছিল।

আমি সাবধান হয়ে গেলাম। গুপ্তচরে সারা বাড়িটা ভর্তি। অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে একটা লম্বা বারান্দা। তারপর একটা বাক। সেদিকে রয়েছে গোটা তিরিশ ঘর। অতিথিরা এখানেই থাকে। সেদিক দিয়েই এগিয়ে গেলাম। একটা ঘরের সামনে দিয়ে যেতে যেতে শুনলাম ফোনের রিং এর শব্দ। দরজায় আড়ি পেতে শুনতে পেলাম ইভের গলা। ল্যারী নামক কোন এক ছোকরাকে সে ফোন করছে। সাতটার সময় আটলান্টিক হোটেলে দেখা করতে বলেছে।

আরও শুনতে পেলাম ইভ বলছে–ওদিকের সব ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করে রেখ। হ্যাঁ, শুধু সময়ের অপেক্ষায়।

ইভের কথাবার্তা শুনে মন এক তিক্ত বিস্বাদে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। নেশাগ্রস্তের মত ঘরে ফিরে এলাম। চুপচাপ অনেকক্ষণ ঘরের মধ্যে বসে ছিলাম। মনে হচ্ছিল যেন কেউ নির্মমভাবে হাতুড়ি পেটা করছে আমায়। সারা শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

.

এদিকে স্বীকারোক্তি রেকর্ড করতে করতে একটা ঘণ্টা কেটে গেল, ফিতে শেষ। নতুন ফিতে লাগিয়ে সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। আড়মোড়া ভেঙ্গে একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে জানলার দিকে এগিয়ে গেল। পড়ন্ত বিকালের রোদে এখনও তেজ আছে। কাঠের ঘরটা গরম হয়ে গেছে, যেন একটা অগ্নিকুণ্ড ঘরেতে খাটের উপর শুয়ে থাকা

প্রাণহীন নিথর শরীরটার দিকে তাকাল শেড। একটানীল রং–এর মাছি মেয়েটার মসৃণ উরু বেয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভোঁকরে উড়তে থাকে অনেকটা যেন ভয় পেয়ে। শেড মেয়েটার দিকে এগিয়ে গেল। দেহটা এখনও শক্ত হতে শুরু করেনি, তবে খুব ঠাণ্ডা। ভয় পেয়ে ছেড়ে দিল হাতটা।

ফিরে এসে হুইস্কির বোতলটা মুখে লাগিয়ে ঢকঢক করে অনেকটা গিলে ফেলল। তারপর আবার টেপের বোতাম টিপে রেকর্ডার চালু করে দিল। রাস্তার দিকে নজর রেখে সে চেয়ারটায় বসল। কাহিনীর দ্বিতীয় ভাগ আবার বলতে শুরু করল।

আমি ভেবে বেশ মজা পাই। একদিকে ভেস্তাল আমাকে পাগলের মত ভালবাসে আর আমিও অন্ধ পাগল বনে গিয়েছি ইভের ভালবাসা পেতে। আমাকে হারাবার ভয়ে ভেস্তাল সবসময় ভয়ে সংকুচিত হয়ে থাকে। আর আমি ইভকে না পেলে পাগল হয়ে যাব–এই ভাবে যখন নিমজ্জিত, তখন একদিন আবিষ্কার করলাম ইভ আর একজনকে ভালবাসে। আমি কিছুতেই তা সহ্য করতে পারছি না। ইভকে ফিরিয়ে আনতে হবে যেমন করেই হোক।

বৃহস্পতিবার ভেস্তালের রোলস রয়েস গাড়িটা নিয়ে অফিসে গেলাম। সন্ধ্যা সাড়ে ছটার সময় ভেস্তালকে ফোন করে বললাম–একটা পুরোনোবন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেছেআমি তাকে এড়াতে পারছি না। ভেস্তাল বন্ধুকে পার্টিতে নিয়ে আসবার জন্য বললে–সে পার্টির পক্ষে অনুপযুক্ত বলে কাটিয়ে দিলাম।

তারপর চলে এলাম আটলান্টিক হোটেলে। একসময় এই প্রেম কুঞ্জে গ্লোরিকে নিয়ে আমি আসতাম। সবই আমার নিখুঁত ভাবে চেনা।

রোলস রয়েস গাড়িটা গাড়ির সারের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলাম। হোটেলের লন পেরিয়ে একটা গাছের আড়ালে টেবিলটায় এসে বসলাম। এখান থেকেই চারিদিক লক্ষ্য করতে থাকলাম।

অদূরে ইভ ও ল্যারি বসে রয়েছে দেখলাম। ছেলেটি আমার বয়সী। ভাল স্বাস্থ্য, দেখতে আমার থেকেও বেশ সুন্দর। তবে তার পরনে রয়েছে একটা স্পোর্টস জ্যাকেট ও জিনের প্যান্ট, যাতে গরীবীর ছাপই স্পষ্ট। আর ইভ একটা সাদা শার্ট পরে রয়েছে। চোখে কালো চশমা। বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে ইভকে।

কিছুক্ষণ পরে ওরা উঠে দাঁড়াল। ইভ একটা পাঁচ ডলারের নোট টেবিলে রাখল। আমি তাদেরকে অনুসরণ করলাম।

ওরা হোটেলের ভেতরের রেস্তোরাঁতে ঢুকল। আমি ঝুল বারান্দা থেকে ওদেরকে লক্ষ্য রাখতে রাখতে মনটা আমার খুশীতে ভরে উঠল। দেখলাম–ভেস্তাল আমার জন্যে যে রকম চাঞ্চল্য প্রকাশ করে, আমার ইভের প্রতি যেরকম টান,ঐ ছেলেটার প্রতি ইভেরও সেরকম আগ্রহ। কিন্তু ল্যারীর ব্যবহারটা অনেকটা ভেস্তালের সঙ্গে আমার ব্যবহারের মতন।

ইভ সারাক্ষণ কথা বলে যাচ্ছে। কিন্তু ছেলেটা বিরক্তি প্রকাশ করছে, অস্থিরভাবে বারবার ঘড়ি দেখছে। এবারেও দেখলাম–খাওয়া শেষ করে টেবিল ছাড়বার আগে ইভই

একটাকুড়ি ডলারের নোট টেবিলে রাখল। তার মানে ছেলেটা ইভের পয়সাতেই আছে। মনটা আমার খুশীতে ভরে গেল। যে পুরুষের টাকা থাকে না, কোন মেয়েই তাকে বেশীদিন পাত্তা দেয় না।

ওরা এগিয়ে যেতে থাকল। ইভ ল্যারীকে বলল–চল, আমরা সমুদ্রের পাড়ে যাই।

ছেলেটা ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল–মাপ কর। আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে হবে। আমি যেতে পারব না।

ইভ কঠোরভাবে বলে উঠল–আমি তোমাকে আগেই বলেছি না, এত তাড়াতাড়ি ফিরতে পারব না। চল, সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসি।

ল্যারী তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলল–তোমাকে বলেছি তো, আমার একটা জরুরী কাজ আছে। সেটা ভীষণই জরুরী। আমাকে সেজন্য একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

ইভের উত্তরের অপেক্ষা না করে ছেলেটা চলে গেল আর ইভ আহত মন নিয়ে গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

একটু পরে ঘুরপাক খেয়ে আমি ইভের সামনে হাজির হলাম। চোখাচোখি হতেই আমি হেসে ফেলে বললাম–আরে তুমি! এখানে একা দাঁড়িয়ে কি করছ? তোমার মায়ের কাছে গেলে না? গল্পটা বেশ ভালই বানিয়েছ।

ইভ কথাটা শুনেই ক্রুদ্ধা সাপিনীর মত ফুঁসে উঠল–পার্টি থেকে এখানে তুমি কি করতে এসেছ?

পার্টিতে যাওয়া আর হল কই? হেসে ফেলে বললাম–যখন কোন লোকের পাশে তার প্রেমিকাকে সহ্য করা সম্ভব হয় না, তখনই সে অন্য বন্ধুর খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। এটা তুমি তো জান ইভ? আমার সেই অবস্থা।

একটু থেমে বললাম–যা আমার কথা ছাড়, লোকটা কে?

খানিকক্ষণ পরে উত্তর দিল ইভ–ও আমার স্বামী, বুঝেছ?

আমার এতক্ষণে স্বতঃস্ফূর্ত মনটা দমে গেল–কথাটা এতদিন চেপে রেখেছিলে কেন?

স্থির দৃষ্টিতে ইভ আমার দিকে তাকিয়ে বলল–সব কথা সবাইকে না বলাই আমার অভ্যাস।

নিজেকে সংযত করে বললাম–এজন্যই তুমি চাকরীটা ছাড়তে চাইছ না। আমি ইভকে সমুদ্রের ধারে যাবার জন্য অনুরোধ করলাম।

.

ইভ যেতে না চাইলেও জোর করে ওর হাত ধরে এগিয়ে গেলাম।

ইডেন এন্ড থেকে রাস্তাটা সোজা বেরিয়ে গেছে। ক্রমশঃ রাস্তটা উঁচুর দিকে উঠেছে আর বাঁ দিকে বালিয়াড়ি নীচে ঢালু হয়ে নেমে গেছে। সত্তর কিলোমিটার স্পীডে আমি গাড়ি চালাচ্ছি। ঠিক যখন লিটল ইডেনের আলোটা চোখে পড়ল, তখনই কটাস করে একটা শব্দ। বাঁদিকের সামনের চাকার টায়ার ফেটে গেল। স্টীয়ারিং ধরে সামলাতে সামলাতেই ভীষণভাবে পাক খেয়ে গাড়িটা বালিয়াড়ির দিকে সাঁ সাঁ করে এগোতে থাকল। গায়ের রক্ত আমার হিম হয়ে গেল।নীচেই সমুদ্র। আমার জীবন বোধহয় আজ এখানেই শেষ হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত চাকাটা বালিতে গেঁথে গিয়ে ঝপ করে থেমে গেল গাড়িটা। একটুর জন্য আমি বেঁচে গেলাম। সে যাত্রায় প্রাণে বেঁচে গেলাম কিন্তু আমার চিন্তাধারাটা পাল্টে গেল।মুহূর্তের মধ্যে আমার মনের পর্দায় ভেসে ওঠা ইভকে পাবার কামনা, টাকা, আমার স্বাধীনতা জ্বলজ্বল করে উঠল।

বাড়িতে যখন ফিরলাম, তখন রাত সাড়ে বারোটা। আমাকে দেখেই ভেস্তাল প্রশ্ন করল–এত রাত করে ফিরলে?

–ফিরতে দেরী হয়ে গেল, চাকাটা মাঝরাস্তায় ফেটে গেল–কথাটা শেষ না করেই শিস দিতে দিতে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম।

কিন্তু ভেস্তাল আমার সামনে এসে পথ আটকে দাঁড়াল। তার চোখের দৃষ্টি কঠিন। ক্রুদ্ধ স্বরে বলল–তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? নিশ্চয়ই কোন মেয়ের সঙ্গে? বল কে কে?

আমি দাঁতে দাঁত চেপে গর্জে উঠে বললাম–পুলিশের সার্জেন্ট জিম কেলার আমার সঙ্গে ছিল। তুমি এখন সরে যাও আমার সামনে থেকে।

মিথ্যে কথা বলছ। বলেই ঠাস করে একটা চড় মারল আমার গালে।

আর দপ্ করে তখনি আমার মাথায় আগুন ধরে গেল। রাগে অন্ধ হয়ে ভেস্তালের হাড্ডিসার দুটো কাঁধ খামচা মেরে ধরলাম। মনে হল যেন জীবনের মত শেষ করে দিই কুৎসিত ডাইনীটাকে।

কিন্তু ততক্ষণে দুটো লোহার মত শক্ত হাত বুলডোজারের মত আমার কব্জি দুটো মুচড়ে ধরেছে।

শান্ত গলায় লেফটেন্যান্ট লেগো বলল–অত উত্তেজিত হবেন না মিঃ উইন্টার্স!

এই হতচ্ছাড়া পুলিশ অফিসার এখানে রয়েছে জানতে পারলে আমি ওর গায়ে কখনও হাত দিতাম না। রাগে আমার সারা শরীর কাঁপছে, একটা মেয়ে হয়ে ভেস্তাল কিনা আমাকে মারবে। নিজেকে সামলে নেবার জন্য একটা সিগারেট ঠোঁটে দিয়ে দেশলাই–এর জন্য এ পকেট ও পকেট হাতড়াতে লাগলাম।

মিঃ লেগো ফস্ করে লাইটার জ্বেলে ধরল আমার মুখের সামনে, তারপর মুচকি হেসে বলল–মাঝে মাঝে নিজের বউকে গলা টিপে মেরে ফেলতে ইচ্ছা করে, তাই না? বোধহয় সবারই? তার কথায় শ্লেষের সুর।

আমিও না ঘাবড়াবার মত করে বললাম হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন বোধ হয়।

এরপর লেগো বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে চলে গেল। যাবার সময় লেগো আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলে গেল আপনার জামার কলারে যে লিপস্টিকের দাগ রয়েছে, সেটায় হয়তো আমার মত মিসেস উইন্টার্স–এর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়ে থাকবে।

আমি তার কথা শুনে নিজের বেখেয়ালের জন্য নিজেকে ধিক্কার দিলাম। খানিকক্ষণ কাঠের পুতুলের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ির ঘা মেরে যাচ্ছে।

সারারাত্তি এপাশ-ওপাশ

১১.

সারারাত এপাশ-ওপাশ করলাম বিছানায়। ঘুম আসছে না কিছুতেই, শেষে সান্ত্বনা পাবার আশায় ইভের কাছে যাব বলে স্থির করলাম।

হল ঘরের ঘড়িটা ঢং ঢং করে বেজে রাত তিনটে নির্দেশ করল। আমি দরজা খুলে মুখ বাড়ালাম। কেউ নেই দেখে বাইরে বেরিয়ে দরজায় নিঃশব্দে তালা লাগালাম। সোজা ইভের। ঘরের সামনে। দরজার হাতলটা আস্তে করে চাপ দিতেই দরজাটা খুলে গেল।দরজাটা বন্ধ করবার শব্দ হতেই ইভ জেগে গেল।

কে? ভয়ার্ত গলায় ইভ প্রশ্ন করে!–আমি।চুপকথাবলোনা–আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম ইভের বিছানার দিকে।

সে প্রথমে আমাকে দেখে ক্ষেপে গেল। চাপা গলায় বলল–সেদিন ভাগ্য জোরে বেঁচে গেছ। আবার আজ! বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে।

আমি যথাসম্ভব কোমল গলায় ইভকে নানান কথা দিয়ে বুঝিয়ে শান্ত করলাম। তাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব দিলাম। সে বলল–তা কি করে সম্ভব? আমি তো একজনের বিবাহিত স্ত্রী।

আমি ব্যঙ্গের সঙ্গে বললাম–ছ কোটি ডলার আমার পকেটে ঝলমল করলে ঐ রকম স্বামীকে ফুটিয়ে দিতে কতক্ষণ? মাত্র বছরখানেক। সে সময়টাইওরোপে ঘুরে বেড়াব তারপর বিচ্ছেদ পেয়ে গেলেই আমরা বিয়ে করে ফেলব।

ইভ বলল–কিন্তু মিসেস ভেস্তাল! আমি ইভকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম–আমি আর কোন সম্ভাবনা নিয়ে বসে থাকতে পারব না। এমন কিছু ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে ভেস্তাল মারা যায়। আর তখনি ছ কোটি ডলার আমার হাতের মুঠোয়।

অবিশ্বাসের গলায় ইভ বলল–তার মানে?

মৃদু হেসে বললাম–আমি ভেস্তালকে খুন করব।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ইভ। তারপর চাপা গলায় বলল–খুন করবে? কি ভাবে?

বুঝতে পারলাম ইভকে বস মানানো গেছে। তবুও তাকে আমি সারাটা রাত ভাববার সময় দিলাম।

ইভ বলল–ভাববার কিছু নেই। আমি তোমাকে বিয়ে করব। আমি তোমাকে চাই, কেবল কাজটা যেন নিরাপদে হয়।

আমি আবেগে ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলাম, ওর শরীরের স্পর্শে আমি উষ্ণতা বোধ করলাম।

আমি গত রাত্রে ফেরবার পর যা ঘটনা ঘটেছে, ভেস্তালের কথা, লেগোর সাবধানবানী সবই একেএকে গুছিয়ে বললাম। আমি সেদিনই খুনের পরিকল্পনাটা ওকে জানিয়ে দিলাম। পরিকল্পনার প্রতিটি ধাপ ইভকে ভাল করে বুঝিয়ে দিলাম।

ইভ এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব পেয়ে খানিকটা গভীরভাবে চিন্তা করল। সে ভয় পেয়ে গেল।

আমি তাকে মনে সাহস দিয়ে বললাম–কোন চিন্তা নেই, মনে জোর আনন। তাহলে আমাদের মুক্তি।

তাকে গভীরভাবে চুম্বন দিয়ে বললাম–দুজনে একসঙ্গে এতবড় সম্পত্তির মালিক। ইভ ভেস্তালের টাকার চেয়ে তোমাকে আমি বেশী করে পেতে চাই।

তুমি সবই পাবে, শেড ডার্লিং–ইভ দুহাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে চুম খেল। ওর নরম নরম উদ্ধত বুক দুটো আমার বুকের সঙ্গে লেপটে গেল–সাবধানে কাজ কর শেড।

ঘড়িতে চারটে বাজে।–কিছু ভেবো না ইভ। সব ঠিক হয়ে যাবে। পরিকল্পনাটার মধ্যে কোন খুঁত থেকে গেল কিনা একবার ভেবে দেখ। ওর গালে আদুরে টোকা মেরে ওর কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

সেদিন অনেক বেলা করে উঠলাম। স্নান করবার সময় আমার খেয়াল হল ভেস্তালের কাছে আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত। তা না হলে ভেস্তাল শান্ত হবে না, আর আমার পরিকল্পনাও সফল হবে না। ভাবামাত্রই ওর ঘরে ফোন করলাম।

কে? কর্কশ গলা ভেসে এল ভেস্তালের–কি চাই?

তোমার কাছে আমার দোষ স্বীকার করবার একটা সুযোগ দাও, ভেস্তাল। আমার কণ্ঠে ঝরে পড়ছে ক্ষমা চাওয়ার সুর।

ভেস্তাল কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল–বেশ, আধঘণ্টা পরে এস।

মুখখানায় দুঃখের ভাব এনে কাচুমাচু করে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। একটা ছক আগে থেকেই কষে ফেলেছিলাম।

আমি খুবই দুঃখিত ভেস্তাল। জিম আর আমি অতিমাত্রায় পান করে ফেলেছিলাম। তারপর ওর পাল্লায় পড়ে বেশ্যাবাড়ি যেতে হল। ভেস্তাল আমাকে ক্ষমা করো, আর কখনও এরকম হবে না–বলতে বলতে ওর হাতদুটো জড়িয়ে ধরলাম।

এতেই কাজ হয়ে গেল। ভেস্তাল আমাকে জড়িয়ে ধরল, বলল–ওহ শেড ডার্লিং, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে ক্ষমা করব। আমাকে তুমি ভুল বুঝো না। পুরুষমানুষ এক–আধবার বেশ্যাবাড়ি গেলে কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু আর কখনও যেও না।–গালে গাল ঘষতে লাগল।

ভেস্তাল ভেবেছিল ও আমাকে হারাতে বসেছে। ওর মধ্য থেকে রাগ বা হিংসে যেন দূর হয়ে গেছে। আমি হয়ত অন্য মেয়ের পাল্লায় পড়েছি–এটা আন্দাজ করেছিল সে।

দেখুন মিঃ অ্যাটর্নী সাহেব কত সহজে সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

.

১২.

কয়েকদিন পরের কথা।

আমি অফিসে যাবার আগে কয়েকটা দরকারী চিঠিপত্র দেখছিলাম। ইভ আমার ঘরে ঢুকল একগাদা চিঠিপত্র নিয়ে। একটা চিরকুট আলাদা বের করে আমার সামনে রেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

আমি চিঠিটা পড়লাম। তাতে লেখা ছিল–এইমাত্র ভেস্তাল মিসেস এলিস–এর সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছেন। আঠাশে সপ্টেম্বর শুক্রবার রাত সাড়ে নটায়। বেহালাবাদক স্টোয়েনস্কির সঙ্গে ভেস্তাল দেখা করতে যাবেন।

আর হাতে তিনটে দিন সময় আছে। একদিকে মুক্তি পাবার আনন্দ অপরদিকে ভেস্তালকে খুন করবার এক অজানা অনুভূতিতে বুকটা ধড়াস করে উঠল।

কাগজটা পুড়িয়ে দিয়ে ভাবতে থাকলাম সামান্য ভুল হলেই সব শেষ। মিসেস এলিস ভেস্তালের নিকটতম বান্ধবী আর স্টোয়েনস্কি একটা ভণ্ড, তবে ধনী কুমারী মেয়েদের বা বউদের পটাতে ওস্তাদ।

একটা আশঙ্কা আমার শিরদাঁড়া বেয়ে ঘোরা–ফেরা করছে। একবার যে ব্যাপারগুলো ইভের সঙ্গে আলোচনা করে নেব, তার কোন সুযোগ নেই।

এখন প্রতিদিন ভেস্তালের সঙ্গে শুতে হচ্ছে, নব বিবাহিত স্ত্রীর মতই সারাটা রাত ধরে ওকে খুশী করতে হচ্ছে। যাক্ আর তো কটা দিন।

অফিসে বেরোবার সময় দেখলাম ইভ পাশ দিয়ে যাচ্ছে। ইঙ্গিতে ওকে বললাম–বৃহস্পতিবার বেলা দুটোর সময়। সমুদ্রপাড়ের কুঁড়ে ঘর।

ও মাথা নেড়ে জানাল যে ও বুঝেছে।

অফিসে গিয়ে পরিকল্পনামত কয়েকটা চিঠি বেছে নিয়ে টেপরেকর্ডারের নম্বর অনুযায়ী সময় দেখে ডিকটেশান দিলাম। মনে বেশ ভয় লাগল কিন্তু ফেরারও যে কোন উপায় নেই।

বৃহস্পতিবার অফিসে গিয়ে রায়ান ব্ল্যাকস্টেনকে ফোন করলাম।–ভেস্তালকে একটা সারপ্রাইজ দেব। তাছাড়া অনেক দরকার আছে। তুমি ঠিক নটা পনের মিনিটে আমার বাড়িতে আসবে।

তারপর মিস গুডচাইল্ডকে ফোন করলাম। তাকে জানিয়ে দিলাম–লাঞ্চের পর অফিসে ফিরব না। গলফ খেলতে যাব।

লিটল ইডেনে ছটা মাঠ রয়েছে। ভেস্তাল যদি ফোন করে আমার খোঁজ করে, সে কখনোই খুঁজে পাবে না আমাকে।

লাঞ্চ সেরে সোজা সমুদ্রের পাশের কুঁড়েঘরটাতে চলে এলাম।

এটা ভেস্তালের ঘর হলেও এই ঘরে সে আসে না। বাড়ির সুইমিং পুলেই সে সাঁতার কাটে। এক প্রান্তে নির্জন পরিবেশে এই কুঁড়ে ঘরটা আমার বেশ ভাল লাগে। এখানে অনেক আড়াল, গাড়ি লুকিয়ে রাখবার জায়গাও রয়েছে। আমি ঘরের দরজা, জানালা খুলে দিলাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ইভ চলে এল।

ইভ ঘরে ঢুকতে দেখলাম ওর মুখটা বিবর্ণ। বুঝতে পারলাম আমার মত ইভের মনও সংকুচিত ও উত্তেজনাপূর্ণ।

ইভকে আমার একটা মূর্তি গড়ে ফেলবার কথা বলেছিলাম। দেখলাম ইভ তার দিয়ে তৈরী একটা লম্বা মত চোঙ্গা, টেবিলের একপাশে রাখল। বলল–এটা কাল রাতে তৈরী করেছি, দেখ এটাতে কাজ হবে কি না।

আমার সামনের টেবিলের উপর টেপরেকর্ডার ছিল। আমি ইভের উদ্দেশ্যে বললাম–প্রথমে আমরা মঞ্চটা একটু সাজিয়ে দেখি। ইভ সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এল।

প্রথমে চোঙাটাকে চেয়ারের ওপর বসিয়ে দিলাম। আমার কোটটা খুলে কায়দা করে চোঙাটাকে পরিয়ে দিলাম। একটা জ্বলন্ত সিগারেটও তার মধ্যে গুঁজে দিলাম। তারপর টেপরেকর্ডারটা চালু করে দিলাম।

আমি ও ইভ ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম। শুনলাম কোন খুঁত আছে কিনা ভাল করে বোঝবার চেষ্টা করলাম।

চেয়ারের উপর আমার হাতের অংশ দেখা যাচ্ছে। সিগারেটের ধোঁয়া উঠছেকুণ্ডলী আকারে। টেপে আমার গলা নিখুঁতভাবে শোনা যাচ্ছে। টেপের মাঝামাঝি অংশে এসে ডিকটেশান বন্ধ হল। সামান্য জোরে আমার গলার স্বরে শোনা গেল–রায়ান, তোমাকে বসিয়ে রাখবার জন্য দুঃখিত। আর বিশেষ দেরী নেই।

পুরো ব্যাপারটা একেবারে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। নিখুঁত, একেবারে অচিন্ত্যনীয়। অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ায় আমরা পরস্পরের দিকে তাকালাম। কিন্তু হাসতে গিয়েও হাসতে পারলাম না। দুজনের শরীর মৃদু কেঁপে চলেছে। টেপটা শুনলাম–শেষ পর্যন্ত।

টেপ বন্ধ করে দিলাম–তুমি যদি ভয় পেয়ে গিয়ে কোন ভুল না করে বস, তাহলে আমরা সফল হব। যে চিঠিগুলো রেকর্ড করেছি সেগুলো ইভকে দিলাম। রায়ানের সঙ্গে কখন কথা বলব। টেপের নম্বরগুলো সময় অনুযায়ী মিলিয়ে মুখস্থ করে নিতে বললাম।

ঘণ্টাদুয়েক পরে আমাদের নাটকের মহড়া শেষ হল। তারপর ওকে কাছে টেনে নিয়ে বললাম–জোর পাচ্ছ তো মনে ইভ? আমাদের দুজনেরই জীবন তোমার হাতে। এখনও যদি বল তাহলে ফেরবার সময় আছে।

ইভ সঙ্গে সঙ্গে বললনা, না, আমি ভয় পাচ্ছি না শেড। কাজটা করতে পারব ঠিক করে।

বেশ। তাহলে আসল নাটকের মহড়া দেবার জন্য প্রস্তুত হও।

পরের দিন আঠাশে সেপ্টেম্বর। শুক্রবার। ভেস্তালের জীবনে অভিশপ্ত দিন, আমার জীবনেও বটে।

পাঁচটার আগেই অফিস থেকে ফিরে এলাম। বাড়িতে এসে দেখলাম ভেস্তা নেই। অ্যাপ্রন আর দুটো হ্যান্ড গ্লাভস এনে আমার ডেস্কের ড্রয়ারের মধ্যে লুকিয়ে রাখলাম। চাকা পাল্টানোর সময় এগুলো আমাকে পরতে হবে, নইলে কালিঝুলি মেখে ব্ল্যাকস্টেনের সামনে আসা যাবে না।

ইভকে ফোন করে জানতে পারলাম–ভেস্তাল সিনেমায় গেছে। ছটার সময় ফিরবে। আমি তার ঘরে যাচ্ছি বলে দিলাম।

সে আপত্তি করেছিল, তবুও গেলাম। ইভকে কেমন ফ্যাকাশে লাগছে। তাকে পুনরায় মনে সাহস দিলাম।

সে জানাল–তার গাড়িটা সে জঙ্গলে লুকিয়ে রেখে এসেছে। আস্তে চালাও সাইনবোর্ডটা যেখানে আছে, সেখানেই রাখা আছে। এটা আমাদের পূর্ব পরিকল্পনার মধ্যে ছিল। সময়ের সামঞ্জস্য আনবার জন্য এটা খুবই জরুরী।

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম মেঘ জমেছে, বোধহয় বৃষ্টি হবে। চাকা পাল্টাবার সময়ে বৃষ্টি হলে বেশ অসুবিধে হবে–আমি বললাম।

ইভ ভয় পেয়ে গেল। বৃষ্টি হলেও কাজটা করবে?

আমি জোর দিয়ে বললামবৃষ্টি কেন, ভূমিকম্প হলেও করব।

ড্রাইভার নিয়ে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম আমার নির্দেশ মত ইভ ওকে চায়ের সঙ্গে ওষুধ খাইয়ে দিয়েছে।

ঘড়িতে তখন ছটা বাজে। ইভকে বললাম–টেপ রেকর্ডটা আমার ঘরে রেখে এস। আর সাড়ে তিনঘন্টা পরে আমরা মুক্ত। ইভ! ভেবে দেখ, এখনও সময় আছে, পিছিয়ে আসার।

তুমি কি পিছিয়ে আসতে চাও? ইভ বলল। আমি মন শক্ত করে বললাম না। এরপর আমি বাগানে গিয়ে ভেস্তালের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ছটার কিছু পরে ভেস্তাল রোলস রয়েস চালিয়ে এল। আমরা সিঁড়ি দিয়ে পাশাপাশি উঠছি। আমার সঙ্গ পেয়ে ভেস্তাল খুব খুশী। ভেস্তাল অনবরত বকবক করে চলেছে। ভালবাসার উজ্জ্বল জ্যোতি ওর চোখে মুখে সুস্পষ্ট।

আর মাত্র তিন ঘণ্টা পরে এই মেয়েটাকে আমি খুন করতে চলেছি। বিশ্বাস করতে পারছি না যেন নিজেকে।

ভেস্তাল বলল–শে ডার্লিং। আমি পোষাক পাল্টাব। তুমি আমার পাশে বসে গল্প করবে।

আমি মিষ্টি করে ননী মাখানো আদুরে গলায় বললাম আমার বিশেষ কটা কাজ রয়েছে। তুমি যাও। আমি একটু পরেই আসছি।

ভেস্তাল রাগ করবার ভান করে বলল–তুমি বেশী খাটাখাটুনীকরছ। এত চিন্তা করবার কোন দরকার নেই। বলেই একটা চুমু খেল। গাটা ঘিন ঘিন করে উঠল, অতি কষ্টে মুখের ভাবটা ঠিক রাখলাম।

নিজের ঘরে এসে ডেস্কের ড্রয়ারটা খুলে দেখলাম জিনিসগুলো সব ঠিকঠিক আছে। দেখে চাবি দিয়ে ড্রয়ারটা বন্ধ করে দিলাম।

এক অজানা আশঙ্কা যেন বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা মারছে।

শূন্য মনে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি। বেশ জোরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। জানলার কাঁচে বৃষ্টির ঝাঁপটা আছড়ে পড়ছে। এমন সময় দরজা নক্ করে অর্গিস ভেতরে ঢুকল। মাপ করবেন, স্যার! জো খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। রাতে মিসেস উইন্টার্সের গাড়িটা লাগবে।

কিছু খেয়েছে হয়তো। পেটে সয়নি।

আমি বললাম–আচ্ছা মিসেস উইন্টার্স নীচে এলে আমি বলে দেব।

অর্গিস দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

.

১৩.

আর কয়েক ঘণ্টা পরেই একটা তাজা প্রাণ আমি নষ্ট করতে চলেছি। হাত–পা ক্রমশঃই ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। ডিনার খেতে বসে ভেস্তাল অন্যান্য বারের মত এবারেও তার সঙ্গে যাবার জন্য আমাকে অনুরোধ করল। কিন্তু আমি জানালাম, রায়ান আসবে, ব্যবসা সংক্রান্ত কথা বলতে হবে। কোন মেয়ের সঙ্গে কাটাব না জেনে ও আমাকে আর জোর করল না।

ডিনার পর্ব শেষ আর হতেই চাইছেনা। মুখে জোর করে কিছু গুঁজে দিচ্ছিলাম। ভয় পাচ্ছিলাম, যদি ভেস্তাল কিছু আন্দাজ করে ফেলে।

বাইরে ঘোর অন্ধকার। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। ভেস্তাল ডিনার শেষ করে বলল–দেখ, এতদিন বৃষ্টি নেই, আর ঠিক আমার বেরোবার সময়েই বৃষ্টি।

সে উঠে গিয়ে জানালার পর্দাটা সরিয়ে দেখল।–এরকম বৃষ্টি হলে যেতে পারব বলে মনে হয় না।

আমি মনে মনে এই আশঙ্কা করছিলাম। তাকে একটু বাজিয়ে দেখবার জন্য বললাম–বৃষ্টিতে ঘরে বসে থাকলে আরো মন খারাপ হয়ে যাবে। যা আজ টিভির প্রোগ্রাম দেখেই সময় কাটাবে। মিসেস এলিসকে বলে দাও, তুমি যেতে পারবে না।

স্টোয়েনস্কির সঙ্গে দেখা করবার ভীষণ ইচ্ছা আমার, পরে ঠিক সময় নাও হতে পারে। অথচ বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালাতে আমার ভয়ও লাগে।

অর্গিস কফি ঢালছিল। ভেস্তালের নির্দেশে সে দেখতে গেল ড্রাইভার জো সুস্থ হয়েছে কিনা।

ভেস্তাল বলল–দরকারের সময় না পেলে তবে ড্রাইভারের প্রয়োজন কিসের?

আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম–ওর কি ইচ্ছে করে অসুখ হয়েছে, হঠাৎ করেই হয়েছে। আমি বলে ফেললাম, বৃষ্টির মধ্যে তোমার গাড়ি চালাতে যে কি অসুবিধা, আমি তাও বুঝি না।

ভেস্তাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল, বলল–তুমি যেন আজ কেমন অদ্ভুত ধরনের আচরণ করছ সন্ধ্যাবেলা থেকে।

আবার সেই বোকামী। তার কথাটা হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলাম,দূর ছাই। তুমি কিযে বল? আমি ঠিক আছি। অদ্ভুত আচরণ তুমি আমার মধ্যে কি দেখলে?

এমন সময় অর্গিস এসে জানাল–সরি ম্যাডাম, জো খুবই অসুস্থ। আবারও বমি করেছে।

আমি একটা সুযোগ নিলাম–তবে বরং তোমার আজ গিয়ে কাজ নেই। ওই বেহালাবাদক স্তাবকদের ভিড়ে তোমার খেয়াল অত রাখবে না।

আমার কথা শুনে ভেস্তালের জেদ আরো বেড়ে গেল। মেজাজের সঙ্গে বলে উঠল–আমার পথ চেয়েই সে বসে আছে, আমি নিশ্চিত জানি। আমার জন্যই এলিসের নিমন্ত্রণ নিয়েছে স্টোয়েনস্কি।

ঠিক আছে, তোমার যাবার ইচ্ছা হয় তো যাও। রেডী হয়ে নাও, নটা প্রায় বাজে।

হ্যাঁ, আমি এখনি তৈরী হয়ে নিচ্ছি–ভেস্তাল আবার অনুরোধ করল তার সঙ্গে আমাকে যাবার জন্য।

ডার্লিং, আমাকে মাপ করো আমি ক্ষমা চাওয়ার সুরে বললাম ব্ল্যাকস্টেন এসে ফিরে যাবে। সেটা কি ভাল হবে?

ভেস্তালকে সন্দেহ মুক্ত করবার জন্য আমি জড়িয়ে ধরে চুমু খেলাম। আর তাতেই ভেস্তালের চোখে কামনার উত্তেজনা জেগে উঠল। বলল–আজ রাতে গিয়ে আর কাজ নেই। দুজনে এক সঙ্গে রাত কাটাব। কেমন?

আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম–এখন রাত এগারোটা পর্যন্ত ব্ল্যাকস্টেন তো থাকবেই। তার আগে তো তুমি আমাকে পাবে না।

বেশ, তাহলে, আজ রাতে–শে।কথাটা সম্পূর্ণ না করেই ও বেরিয়ে গেল।

ভেস্তালের প্রশ্নের উত্তরে অর্গিস বললনা, এখন সেরকম বৃষ্টি নেই। আপনি ঠিক মত যেতে পারবেন তো?

–হ্যাঁ পারব, ভেস্তাল বলল–তবে ফিরতে আমার দেরী হতে পারে। সাড়ে বারোটা হবে হয়তো।

ভেস্তাল চলে গেল। সদর দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ইভ আমার পড়ার ঘরে এসে ঢুকল। চোখে মুখে ভয়ের চিহ্ন। মুখটা ফ্যাকাশে লাগছিল।

সে আমার হাতে একটা টুপী দিয়ে বলল–মাথা ভেজা অবস্থায় মিঃ রায়ানের সামনে হাজির হলে সন্দেহের কারণ ঘটতে পারে।

আমি ইভকে পুনরায় মনে সাহস দিয়ে বললাম–এবার সব দায়িত্ব তোমার, ঠিক যেমনভাবে বলেছি।

আচ্ছা, বলে ইভ ড্রয়ার টেনে অ্যাপ্রন, গ্লাভস দুটো বার করে দিল। বালি ভর্তি ব্যাগটা হঠাৎ যেন বাস্তব পরিস্থিতিকে জীবন্ত করে তুলল।

আমি সেগুলো নিয়ে জানালার দিকে এগিয়ে গেলাম।ইভের দিকে ফিরে বললাম–গুড লাক, ইভ। মনে জোর এনে কাজ কর। আধঘণ্টার মধ্যে আমি ফিরে আসব।

ইভ মাথা নাড়ল। জানালা গলে নীচে নেমে পড়লাম। ইভ জানালা বন্ধ করে দিল।

বৃষ্টি নেই বললেই চলে কিন্তু বাতাস বেশ জোরে বইছে। আমি গ্যারেজের দিকে বেশ দ্রুত এগিয়ে গেলাম। যাতে ভিজে না যায় সেজন্য ঘুরপথে আসতে ভেস্তালের একটু বেশী সময় লাগবে। আমাকে শুধুমাত্র লনটুকু পার হতে হবে।

কয়লার মত কালো অন্ধকারে চারিদিক ঢেকে রয়েছে। থমকে লনটা ছুটে পার হয়ে গিয়ে এক জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। গ্যারেজটা ভূতের অন্ধকারের মত দাঁড়িয়ে

রয়েছে। ওটার কাছে গেলেই অটোমেটিক আলো জ্বলে উঠবে। অন্ধকারের মধ্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ভেস্তাল আসছে, অন্ধকারের মধ্যে তার সাদা বর্ষাতিটা চোখে পড়ল। বুকটা ধক ধক করতে লাগল। ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। বালি ভর্তি ব্যাগটা শক্ত হাতে ধরে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ভেস্তাল হাঁটতে হাঁটতে গুন গুন করে গান গাইছিল। ওর মুখটা যেন চিন্তান্বিত। ও গ্যারেজের কাছে আসতেই আলো জ্বলে উঠল, দরজাও খুলে গেল। ও ভেতরে ঢুকল।

ক্রেসপাতের জুতো পড়েছিলাম। নিঃশব্দে ভেস্তালের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

ভেস্তাল গাড়ির দরজা খুলছে। ও বোধহয় অমঙ্গল কিছু আশঙ্কা করেছিল। হয়তো ওর সহজাত প্রবৃত্তি ওকে সাবধান করে দিল আর তাই সে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন দিকে দেখার চেষ্টা করল। ওর মুখটা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। আর আমার বুকের ভেতরটাও শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

এই সুযোগে বালিভর্তি থলেটা দিয়ে ওর মাথার ঠিক মাঝখানে আঘাত করলাম। হাঁটু দুমড়ে গেল, গাড়ির দরজা থেকে হাতটা খসে পড়ল।

আমার চাপা ঠোঁট ভেদ করে নিঃশ্বাস হিসহিস শব্দে ছিটকে বেরিয়ে এল।

আবার ব্যাগটা ঘুরিয়ে দ্বিতীয় বার আঘাত করলামসর্বশক্তি দিয়ে। ওর মাথাটা দুলে উঠেঝাঁকুনি দিয়ে একপাশে কাত হয়ে গেল। ও ঢলে পড়তে চাইল। আমি বালির ব্যাগটা ফেলে দিয়ে ওর শরীরটা ধরে ফেললাম।

আমার গায়ের সঙ্গে ওকে চেপে ধরে নিলাম ন্যাকড়ার পুতুলের মত। গাড়ির দরজা খুলে ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে সামনের আসনে বসিয়ে দিলাম, ডানদিকের দরজায় হেলান দিয়ে রাখলাম।

বালি ভর্তি ব্যাগটা তুলে স্টীয়ারিং-এর নীচে রাখলাম। তখনই হঠাৎ মনে হল–গাড়ির চাবি কোথায়? ইঞ্জিন চালু করব কি করে? শরীর ঘামে ভিজে যাচ্ছে। হাত দুটো কাঁপছে, ওর ব্যাগটা ওলট–পালট করে ঘাটলাম কিন্তু কই চাবি কোথায়! আতঙ্কে কিছু মনে করতে পারছি না। সর্বনাশ! কি হবে? সময় যে বয়ে যাচ্ছে। ড্যাশ বোর্ডের ঘড়িটাতে সময় দেখলামনটা বেজে সাত।

নিজের বোকামীর জন্যে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলাম, গাড়ি থেকে নেমে গ্যারেজের মাঝে, চারপাশে খুঁজতে লাগলাম। অবশেষে গাড়ির নিচে চাবিটা পেলাম। কখন ভেস্তালের হাত থেকে ঠিকরে গিয়ে নীচে পড়েছে।

চাবিটা নিয়ে ইঞ্জিন চালু করে ফিরে দেখলাম একবার। কাত হয়ে গাড়ির দরজায় ঠেস দিয়ে ও বসে আছে। মাথাটা পেছনের দিকে হেলান। মুখটা সামান্য হাঁ হয়ে রয়েছে, চোখ দুটো বোজা। ধীরে ধীরে বুকটা ওঠা–নামা করছে, মাথা থেকে একটা সরু রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে।

প্রথমে খুব আস্তে, তারপর রাস্তায় পড়ে গাড়ি জোরে ছুটিয়ে দিলাম ক্লিক রোডের মাথায় আসতে তিন মিনিট সময় লাগল। বাতাসের জোর অনেক বেশী। গাড়ির কাঁচে বৃষ্টির পশলা আছড়ে পড়ছে। ওয়াইপার দুটো চালিয়ে দিলাম। গাড়ির আলো নিভিয়ে দিলাম। বাঁকের কাছে গিয়ে গাড়ি থামাতে দেখলাম সামনের বাঁকের মুখে মাইলখানেকনীচে একটা গাড়ির আলো এগিয়ে আসছে। নিশ্চিত রায়ানের গাড়ি।

ভেস্তালকে পুরো আমার কোলে বসিয়ে নিলাম। মাথাটা টেনে সোজা করে রাখলাম। হাত দুটোকে স্টীয়ারিং হুইলের সঙ্গে আটকে রাখলাম।

ওর মাথাটা পিছন দিকে হেলে যাচ্ছে। আমার গালের সঙ্গে ওর মাথাটা ঠেকিয়ে নিয়ে আমার নিজের শরীরটা দুমড়ে নিয়ে একেবারে সীটের সঙ্গে মিশিয়ে দিলাম। গীয়ারটা চেঞ্জ করে ইঞ্জিন চালু করে দিলাম। বাঁক ঘোরবার আগে সামনের হেডলাইট জ্বালিয়ে দিলাম।

ব্ল্যাকস্টেন খুব জোরে গাড়ি চালাচ্ছিল কিন্তু আমার গাড়ি দেখেই সে গাড়ির গতি কমিয়ে দিল। আমি গাড়ির স্পীডটা বাড়াতে যাব, এমন সময় ভেস্তালের চাপা গোঙানির শব্দ শোনা গেল, এত ভয় আমি কোনদিনও পাইনি। গাড়িটা আমার আয়ত্তের বাইরে চলে গেল। আমি আঁতকে উঠলাম।

রাস্তা ছেড়ে ঘাসের উপর উঠে গেল গাড়ির চাকা। সামনেই সাদা বেড়া। ধাক্কা খেলেই একেবারে নশশো ফুট নীচে পড়বে।

কোনরকমে স্টয়ারিং ঘুরিয়ে নিতে পারলাম। রাগেদাঁত কিড়মিড় করে ভেস্তালের ঘাড়টা ধরে ওর মুখখানা ড্যাশ বোর্ডের উপর ঠুকে দিলাম। আঘাতটা জোরে না হলেও জ্ঞান হারিয়ে ফেলল ভেস্তাল।

ব্ল্যাকস্টেন কাছাকাছি চলে এসেছে। আমি গাড়ির গতি আরো বাড়িয়ে দিলাম। সে হর্ন বাজাল কিন্তু আমি কোন প্রত্যুত্তর দিতে পারলাম না। বাঁকটার মুখে এসে আমি গাড়ির ব্রেক কষলাম। দৃষ্টির বাইরে এসে গাড়িটা থামালাম। ব্ল্যাকস্টেনের গাড়ির পেছনের লাল আলোটা যতক্ষণ না অদৃশ্য হল, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি গাড়ির মধ্যে বসে রইলাম।

তারপর গাড়ি থেকে নেমে এলাম। ভেস্তালকে গাড়ির মধ্যে ঠেস দিয়ে বসিয়ে রাখলাম।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ব্ল্যাকস্টেনবাড়ি পৌঁছে যাবে। তাকে কিছুতেই কুড়ি মিনিটের বেশীবসিয়ে রাখা যাবে না। সুতরাং পঁচিশ মিনিটের মধ্যে চাকা বদল করে গাড়িটা খাদে ফেলতে হবে।

তাড়াতাড়ি সব কাজ করে ফেলতে হবে, নয়ত ইভ ভয় পেয়ে গেলে মন ভেঙ্গে যাবে আর সে সব গণ্ডগোল করে দেবে। ব্ল্যাকস্টেনেরও সন্দেহ বাড়বে। শরীর ঘামছে। বৃষ্টির মধ্যে গাড়ির কাছে এসে পেছনের খোল থেকে চাকাটা বার করলাম। ভয় হচ্ছিল, জো ফাটা চাকাটা পাল্টে রাখেনি তো। ইস্ আর আমার ভেবে দেখার উপায় নেই।

টায়ারের বেড় ঘুরে হাত দিয়ে কাটা জায়গাটা পেতে যেন প্রাণ ফিরে পেলাম। রেঞ্জ আর স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে আন্দাজে চাকা পাল্টাবার কাজ শুরু করলাম। অন্ধকার চতুর্দিকে কিন্তু আলো জ্বালাতে সাহস পাচ্ছি না। একে তো কাজটা দুঃসাধ্য, তার উপর বৃষ্টিতে বার বার

নাটবল্টগুলো পিছলে যাচ্ছে পরাতে গিয়ে। সাত মিনিটের প্রচেষ্টায় শেষে চাকা খুলল। তাড়াতাড়ি করতে পেরেছি।

এবার কাটা চাকাটা বসাতে হবে। খাপে খাপে বসানোর গর্তগুলো ঠিকমত খুঁজে পাচ্ছি না। হাতড়ে হাতড়ে অবশেষে ছটা নাটের মধ্যে পাঁচটা নাট লাগিয়ে চাকাটা পরিয়ে দিলাম। আর হাতে সময় রয়েছে মাত্র দশ মিনিট। এর মধ্যেই সব কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরতে হবে আমাকে।

দৌড়ে গাড়ির ভেতর ঢুকে স্টার্ট করার জন্য বোতাম টিপতে গিয়ে দেখলাম ভেস্তাল নেই। আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। কাঠের মত শক্ত হয়ে গেলাম।

ততক্ষণে বৃষ্টি আবার জোরে শুরু হল। নিশ্চয়ই ভেস্তাল পালিয়েছে। চাকা বদল করবার সময় ও জ্ঞান ফিরে পেয়েছে কিন্তু দমকা বাতাস বইছে, সে কি গর্জন। গাড়ির হেডলাইট জ্বেলে দিলাম। ঠিক তখনি অন্ধকার খাদের মধ্যে ওকে দেখতে পেলাম। যেন অন্ধকারে কাউকে অচেনা পথে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ভেস্তাল তেমন ভাবে টলতে টলতে এগিয়ে যাচ্ছে খাদটার দিকে।

এরই মধ্যে সে গাড়ি থেকে একশ গজ দূরত্বে চলে গেছে। আমি ভেবে পেলাম না, এখন কি করব? গাড়ি থেকে নেমে আমি তার দিকে ছুটতে শুরু করলাম। হেডলাইটের সামনে আমার দীর্ঘ ছায়া মূর্তি দেখে ভেস্তাল আমাকে দেখতে পেয়ে ছুটে এল,

ওহ শেড! তুমি এসেছ? বেঁচে গেছি। জান শেড আমার মাথায় খুব লেগেছে।

ও কথা বলতে বলতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে গা এলিয়ে দিল। আমি জোর করে ওর হাত ছাড়িয়ে দিতে ও ভয় পেয়ে গেল–শেড, কি হয়েছে? আমাকে ব্যথা দিচ্ছ কেন?

আমার মনে হল এখনি যেন ওর গলাটা টিপে মেরে ফেলে দি। কিন্তু পরমুহূর্তে মনে হল তাহলে খুব ভুল করা হবে।

ভেস্তাল যেন আমার মতলবটা বুঝে ফেলেছে। সে ভয়ে চীৎকার করে উঠল, গাড়িটা লক্ষ্য করে দৌড়তে শুরু করল। আমিও তার পেছন পেছন ছুটলাম। একটা বড় পাথরের টুকরো কুড়িয়ে নিলাম। ভেস্তাল ছুটবার সময় একবার সামনে, একবার পিছনে দেখতে গিয়ে হোঁচট খেল। হাত পা দুমড়ে পড়ে গেল। রক্ত শূন্য ফ্যাকাশে মুখে মৃত্যুর ভয়।

চোখে মুখে আতঙ্ক নিয়ে ভেস্তাল আমাকে দেখছে। আমি তার কাছে যেতেই ও আর্তনাদ করে বলে উঠল–শেড, দয়া করো, মেরো না। আমার সবকিছু তোমাকে দিয়ে দেব। আমাকে বাঁচতে দাও শেড।

আমি ওর ডান হাতের কব্জিটা মুচড়ে ধরলাম। পাথরটার ভার যেন আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমার সারা শরীর থর থর করে কাঁপছে।

ভেস্তাল শেষবারের মত প্রাণফাটা ব্যাকুল আর্তনাদ করল–শেড তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে মেরো না।

আমি ততক্ষণে পাথরটার উঁচাল দিকটা ওর মাথার উপর তুলে দিতেই ও ভয়ে চোখ বুজিয়ে ফেলল। নিশ্চিত মৃত্যু যেন, সে আর পালাল না। মৃত্যুর কাছে নিজেকে সমর্পণ করল।

আর ইতিমধ্যে আমার হাতের পাথরটা ওর মাথার মাঝখানে আছড়ে পড়ল।

রাস্তার উপরই ও ছটফট করতে করতে ঢলে পড়ল। মরে যাচ্ছে ভেস্তাল! কিন্তু তখন আর কিছুই করবার নেই।

জানেন অ্যাটর্নী সাহেব, ভেস্তালের সেই করুন আর্তনাদ আমি এখনও শুনতে পাচ্ছি। এখনও আমার মনের পর্দায় ভেসে উঠছে কি রকম নিষ্ঠুর ভাবে আমি সেদিন তাকে খুন করেছিলাম। তার করুণ মুখখানা

এই সময় ছেলেবেলার একটা ঘটনা আমার মনে পড়ছে। আমাদের একটা পোষা কুকুর ছিল, সেটা পাগল হয়ে গিয়ে আমার হাতে কামড়াল। বাবা তাকে তিনটে গুলি করে মেরে ফেলল। কুকুরটা ছটফট করতে করতে মারা গেল। তার সেই ছটফটানির নির্মম দৃশ্যটা ঘুমের মাঝে স্বপ্নে আমি দেখেছি, কেঁদে উঠেছি।

আর ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! আজ আমি আমার নিজের স্ত্রীকে কি নৃশংস ভাবে হত্যা করলাম। একজন নারীকে আর টাকা পাবার লোভে।যাক্ মৃত্যুপথযাত্রী ভেস্তাল তখন কাতরাচ্ছে। সেই অবস্থায় তার একটা হাত ধরে বস্তার মত রাস্তা দিয়ে টানতে টানতে এনে গাড়িতে তুলে দিলাম।

একমুহূর্তে সব ব্যাপারটা ভেবে নিলাম। পাথরটার কথা মনে হতেই ছুটে গিয়ে নীচের উপত্যকায় ছুঁড়ে দিলাম।

সময় খুব কম। কাজও প্রায় সারা। ফিরে এসে গাড়ির ইঞ্জিন চালু করে ঠেলতে ঠেলতে ঢালু রাস্তায় নিয়ে এলাম।

হেডলাইটের আলোতে সাদা বেড়াটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ভেস্তালের দেহটা তখনও থির থির করে কাঁপছে।

গাড়ির স্টিয়ারিং চালু করে ঘুরিয়ে দিলাম সাদা বেড়াটার দিকে। গাড়িটা রাস্তা ছেড়ে উঠে গেল ঘাসে। তারপর দড়াম করে ধাক্কা মারল বেড়ার গায়ে, বেড়া ভেঙ্গে গাড়িটা হুমড়ি খেয়ে পড়ল। গাছপালার ডাল ভাঙ্গার পট পট শব্দ।

তারপর ধাক্কা খেতে খেতে উল্টেপাল্টে আরও সব পাথরের টুকরো সঙ্গে নিয়ে প্রায় দুশো ফুট নীচে গিয়ে পাথরের গায়েই আটকে গেল গাড়িটা।

পরক্ষণেই গুড়ুম শব্দ। গাড়িটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। সে এক বীভৎস দৃশ্য।

জানলাতে পা রেখে শুনলাম আমার গলার স্বর এখনো চিঠির ডিকটেশান দিচ্ছে।

আহ, প্রাণ ফিরে পেলাম। আমি প্রায় ঠিক সময়ে এসেছি। কিন্তু আমার অ্যাপ্রনটা ভেজা,জুতো কাদায় মাখামাখি আর হাতদুটো নোংরা।

ইভ আমাকে দেখতে পেয়ে একটা তোয়ালে আর স্পঞ্জ ছুঁড়ে দিল আমার দিকে। চাপা গলায় বলল–মিঃ ব্ল্যাকস্টেন আধঘণ্টার উপর বসে আছে। আর টেপ চলবে মাত্র দুমিনিট, তাড়াতাড়ি নিজেকে ঠিক করে নাও।

আমি চুলে চিরুণী বুলিয়ে নিলাম। কোট পরে নিলাম।

আধ গেলাস হুইস্কি খেয়ে নিলাম। বুকপেট জ্বালিয়ে দিল কিন্তু ভাল লাগল।

ভাল করে মুখ মুছে, ইভের কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে লাউঞ্জের দিকে, এগিয়ে গেলাম।

ইভ তোয়ালে, স্পঞ্জ, অ্যাপ্রন, টুপী ডেস্কের নীচের টানাতে ঢুকিয়ে চাবি দিয়ে দিল। টেপ বন্ধ হয়ে গেল।

দুঃখিত রায়ান। তোমাকে অনেকক্ষণ বসতে হল–সহাস্যে তার পাশে বসলাম,আরেকটু হুইস্কি চলবে নাকি রায়ান?

দাও। রায়ান বলল, তুমি আজকাল বড্ড বেশী কাজ করছ। ও ভাল কথা, তোমার স্ত্রীকে দেখলাম।

আমি বললাম–ও তাই নাকি? তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

মিসেস উইন্টার্স ভীষণ জোরে গাড়ি চালাচ্ছিলেন।ঝড় বৃষ্টিতে ঐরকমগতিতে গাড়ি চালালে যে কোন মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

আমি হাসতে হাসতে বললাম–আরে না, না, ওর সব রাস্তা ঘাট জানা। ভয়ের কিছু নেই।

কথাটা ঘুরিয়ে নেবার জন্য বললাম–বাইল্যান্ড অ্যাপ্লায়েন্সেসের খবর কিছু জান?

জানি বইকি, আমিও তো একজন ছোটখাট শেয়ার হোল্ডার। রায়ান উত্তর দিল।

আমার মনে হয় ওরা বাজার ধরে নেবে। তুমি আমি যদি

আমার কথায় ছেদ পড়ল একটা টেলিফোন বেজে ওঠাতে। চমকে উঠলাম আমি। রায়ানকে। বসতে বলে আমি ফোনের কাছে এগিয়ে এলাম। ইভ বলল মিসেস এলিস ফোন করছেন।

হঠাৎ করে ভেঙালের মুখটা আমার মনের পর্দায় ভেসে উঠল। ফোনে, মিসেস এলিসের গলামিঃ উইন্টার্স? মিস ডোলানের কাছ থেকে জানলাম ভেস্তাল আধঘণ্টা আগে বেরিয়েছে, অথচ এখনও এখানে আসে নি।

দেখলাম ব্ল্যাকস্টেন এদিকে তাকিয়ে আছে, আমাদের কথা শুনছে।

আমি মিসেস এলিসকে বললাম–দেখুন, হয়ত আস্তে গাড়ি চালাচ্ছে, এখনি হয়ত পৌঁছে যাবে। আমি এখন খুব ব্যস্ত। কিছু মনে করবেন না, পরে না হয় ফোন করব। ছাড়ছি।

রায়ানের উদ্দেশ্যে বললাম–যতসব ঝামেলা। মিসেস এলিসের ওখানে পৌঁছতে দেরী হচ্ছে দেখে ওরা আশঙ্কা করছে যদি ওর কোন বিপদ হয়ে থাকে।

আরে বাবা, ও মত পাল্টে সিনেমাতেও চলে যেতে পারে।

ব্ল্যাকস্টেন আমার কথা শুনে চঞ্চল হয়ে উঠল, বলল–শেড রাস্তাটা খুব খারাপ। তাছাড়া উনি যা জোরে গাড়ি চালাচ্ছিলেন।

আরে বাবা ঝুঁকি নেবার মেয়ে ভেস্তাল নয়। বোধহয় ও সিনেমাতেই গেছে। বাদ দাও ওসব ফালতু কথা। কাজ শুরু করা যাক। হিসাবটা একেবারে করে দেখাও।

আমার কথা শুনে ব্ল্যাকস্টেন হতাশ হয়ে বলল–তোমার বউ, তুমিই বোঝ।

তারপর আমরা ব্যবসা সংক্রান্ত আলোচনাতে কাটালাম। কুড়ি মিনিট বাদে আবার ফোন এল।

ফোন ধরলাম, লেফটেন্যান্ট লেগোর কণ্ঠস্বর। আমার মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। বুঝলাম, রায়ান তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে এদিকেই তাকিয়ে রয়েছে।

লেগো মিসেস এলিসের বাড়ি থেকে বলছে। চল্লিশ মিনিট কেটে গেছে, ভেস্তাল এখনও পৌঁছায় নি। লেগো আমাদের বাড়িতে আসবে বলল।

আমি বাধা দিয়ে বললাম–আপনি কেন কষ্ট করে আসবেন? আমি বরং এখনি যাচ্ছি।

ব্ল্যাকস্টেকে বললাম–এখনি আমাদের বাড়িতে পুলিশ আসবে।

রায়ান চমকে উঠে বলল–পুলিস কেন?

–আজকের পার্টিতে ভেস্তালের বন্ধু লেফটেন্যান্ট লেগে আছে। ভেস্তাল এখনও পৌঁছায় নি।

রায়ান আমি দুঃখিত। আজকের মত আলোচনা থাক আমাদের। গাড়ি নিয়ে বরং একবার বেরিয়ে দেখি কি হল?

রায়ানকে সঙ্গে নিয়ে যখন লাউঞ্জ থেকে বেরোচ্ছি, তখনি ইভের সামনাসামনি হলাম।

ইভের উদ্দেশ্যে বললাম–দেখি কি হল?মিস ডোলান আপনি পড়ার ঘরটা গুছিয়ে রাখবেন। অনেক কাগজপত্র ফাইল করা দরকার।

ইভ বুঝে গেল ডেস্কের মধ্যে রাখা সব জিনিসগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে।

আমি আস্তে করে বললাম–গাড়িটা ভিজে আছে, ব্যবস্থা করো।

.

১৪.

অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে। জনা দশেক পুলিস অফিসার, জনা কুড়ি দমকল কর্মী, দুটো বড় সার্চ লাইট জ্বেলে ভেস্তালের প্রাণহীন দেহটা তুলে আনল।

ব্ল্যাকস্টেনের গাড়িতে আমি বসেছিলাম। আমার শরীরটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। থর থর করে কাঁপছে। ভাবছি কোন ভুল করে ফেলেছি কিনা?

ইভও আমাদের পেছন পেছন এসেছিল। গাড়িটা যে কাদামাখা আর ভিজে গিয়েছিল, তা কেউ আর বুঝতে পারবে না। ইভ বেশ বুদ্ধিমতী বটে!

একসময় মিঃ লেগো গাড়ির সামনে এসে বলল–ভেস্তালের দেহ পাওয়া গেছে। আমাকে বাড়ি চলে যেতে বলল।

আমার সঙ্গে কথা বলবার সময় ব্ল্যাকস্টেনের দিকে তার নজর পড়াতে জিজ্ঞাসা করল– ইনি কে?

ইনি রায়ান ব্ল্যাকস্টেন, আমার এজেন্ট। রাতে ইনিই আমার সঙ্গে ছিলেন।কথাটা বলে নিজেকে ধিক্কার জানালাম। গাল বাড়িয়ে চড় খাবার কোন দরকার ছিল না। এতে তো সন্দেহ জন্মাতে পারে।

মিঃ লেগো আগামীকাল সকালবেলায় আমার সঙ্গে দেখা করবে, জানাল। তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে আমি ব্ল্যাকস্টেনের গাড়িতেই বাড়ি ফিরে এলাম। ব্ল্যাকস্টে আমাকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেল।

পড়ার ঘরে ফিরে এসে খানিকটা হুইস্কি গলাধঃকরণ করলাম। সব যেন কেমন গোল পাকিয়ে যাচ্ছিল।

ইভ এল। দরজা বন্ধ করে দেবার পর আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, সব ঠিকমত হয়েছে

হ্যাঁ,সব ঠিকমতই হয়েছে। চেয়ারের উপর চোঙাটা বসিয়ে তার উপর তোমার কোট চাপিয়ে দিয়ে নকল হাতটার মধ্যে একটা সিগারেট গুঁজে দিলাম। দশ মিনিট পরেই অর্গিসকে ডেকে পাঠালাম। পড়ার ঘর খুলে আমি বেরিয়ে গেলাম। টেপরেকর্ডারের চিঠির ডিকটেশান শুনে অর্গিস মনে করল তুমি ঘরেই আছ। সে কফি আনল, টেবিলে রাখল। হাতলে রাখা তোমার নকল হাতটা সে দেখতে পেল। তারপর ব্ল্যাকস্টেন এলে অর্গিসকে নির্দেশ দিলাম লাউঞ্জে বসাবার জন্য।

আমিও দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। বললাম–আধঘণ্টা তুমি ভীষণ ব্যস্ত। অর্গিস যখন ঘরে এসেছিল আমি তোমার চেয়ার আগলে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

ব্ল্যাকস্টেনকে বসতে বলে তার কাছ থেকে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে দিলাম। সব ব্যাপারটা ঠিক আছে তো?

আমি ওকে অভিবাদন জানালাম, ইভ বলল–এত নিখুঁতভাবে সব কাজগুলো হয়েছে ঘটনাটা যে সাজান, তা মনেই হবে না।

আমি ইভকে বললাম, তুমি অর্গিসকে খবরটা দাও। কেমন? বলতে বলতে প্রায় টলতে টলতে এসে ইভকে জড়িয়ে ধরলাম। আমরা মুক্ত হয়ে গেছি ইভ, বুঝেছ। আমরা খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে করব কি বল?

ইভ বেশ রুক্ষভাবে আমাকে ঠেলে দিয়ে বলল–তুমি আমার কাছ থেকে এখন দূরে থাক। এখনও আমরা নিরাপদ নই। মিঃ লেগো ভীষণ চতুর। উনি বুঝে ফেলতে পারেন যে পুরোটাই আমাদের ষড়যন্ত্র। তুমি আমার কাছে এখন এস না। বিপদ আরো বাড়বে।

আমি সরলভাবে বললাম–তুমি কমাসের মধ্যে আমাকে বিয়ে করবে ইভ?

তার চোখ দুটো স্ফুলিঙ্গের মত জ্বলে উঠল,তুমি পাগল হয়েছ? এর পরও বলছ তোমাকে বিয়ে করতে? তুমি আমাকে মুক্তি দাও। পুলিস যদি আমাদের সম্পর্ক জানতে পারে, তাহলে আইনের কাছে আমরা ধরা পড়ব। আমি খুব তাড়াতাড়ি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। তোমার সঙ্গে আমার দেখা করবার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

রাগে আমার হাত পা জ্বালা করছে। বললাম–এত সহজে তুমি আমার হাত থেকে রেহাই পাবে না। আমাকে যদি বিয়ে না কর তাহলে আমি তো পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করব আর তোমাকেও ফাসাব।

তোমার হিম্মত যদি থাকে, তাহলে পুলিসের কাছে স্বীকার করবে তুমি খুন করেছ। পরিকল্পনা তোমার, আমি কেবলমাত্র তোমার সঙ্গে ছিলাম। আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করবে না শেড–তফাতে থাক।

কথা শেষ করে শরীরে একটা পাক খাইয়ে দর্পিত ভঙ্গীতে ইভ আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বুঝে উঠতে পারলাম না ইভের হঠাৎ কি হল! ল্যারীর পরামর্শেই কি ওর মনটা ঘুরে গেল? যাক্, ইভকে পরে ঠিক হাতের মুঠোয় নিয়ে আসব। এই মুহূর্তেই নিজের জন্য বেশী চিন্তা হচ্ছে।

কি বীভৎসভাবে মরতে হল ভেস্তালকে। কোন ভুল করিনি, তাহলে পুলিসের হাতে ধরা পড়ে ইলেকট্রিক চেয়ারে আমাকে প্রাণ দিতে হবে! ভাবতে গা–টা শিউরে উঠল। সারা রাত দু চোখের পাতা এক করতে পারলাম না।

সময় যেন আর কাটতে চাইছে না। প্রাতঃরাশ দেবার সময় লক্ষ্য করলাম দাস–দাসীরা সবাই কাঁদছে। মিঃ লেগো বলেছিল, এগারোটার সময় আসবে। কিন্তু তার আগমনের কোন লক্ষ্মণ তো, দেখতে পাচ্ছি না। অফিসে বেরোব বলে ভাবছি, এমন সময় ফোন এলব্ল্যাকস্টেনের ফোন।

মিঃ লেগো এতক্ষণ তার অফিসে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। কেবল বার বার এক কথা। কাল নটা থেকে দশটার সময় আমি কোথায় ছিলাম!

মিঃ উইন্টার্স বা মিস ডোলান এসময় কি করছিল–এরকম নানান প্রশ্ন।

আমি তাকে বলেছি, এটা নিছকই দুর্ঘটনা মাত্র কারণ মিসেস উইন্টার্স খুব জোরে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি আমার কথা মানতে চাইছে না।

ব্ল্যাকস্টেনের কথা শুনে আমার হাত পা কাঁপছে।

ব্ল্যাকস্টেন আবার বলল–উইন্টার্স, তোমাকে একটা কথা বলি গোপনে। আমার মনে হয় মিঃ লেগো তোমাকে পছন্দ করেন না।

গলার স্বর সংযত রেখে বললাম–স্বাভাবিক। মিঃ লেগো ভেস্তালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তুমি আমার হয়ে যা বলেছ, তা তো আর ভুল বল নি।

তুমি নিজে জান যে, ভেস্তালের মৃত্যু একটা দুর্ঘটনা মাত্র। তোমার সঙ্গে কথা বলার পর মিঃ লেগোর ধারণা হয়ত পাল্টে যাবে। তুমি সব সত্যি কথা বলেছ, এজন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।

ব্ল্যাকস্টেন বলল–না, না, এটা তো আমার চোখে দেখা। তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পার। আমি সর্বদা তোমার পাশে থাকব।

ফোন রেখে দিয়ে ভাবলাম এবার অফিসে যাই।

লেফটেন্যান্ট লেগো আমাকে সন্দেহ করছে। লোকটার অনুমান শক্তি যে প্রখর তা মানতেই হবে। আমাকে খুব সতর্ক থাকতে হবে। ভাবতে ভাবতে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাগানের দিকে চোখ পড়তেই দেখলাম একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আর তার ভেতরে একজন পুলিস অফিসার বসে রয়েছে। তার মানে এখন লেগো আসবে।

আমি তাড়াতাড়ি টেবিলে গিয়ে বসলাম। ঘড়িতে তখন এগারোটা বেজে চল্লিশ মিনিট।

এক গাদা চিঠিপত্র নিয়ে বসলাম। এমন ভাব দেখালাম যেন আমি কত ব্যস্ত।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদে আমার ঘরের দরজায় টোকা পড়ল। দরজা খুলে দেখলাম মিঃ লেগো।বললাম–গুড মনিং, লেফটেন্যান্ট!আসুন!হুইস্কি ঢালি? গলার স্বর পুরোপুরি স্বাভাবিক।

মিঃ লেগো একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বলল না, ধন্যবাদ।

আমি নিজের মনকে প্রবোধ দিলাম, আমি ছ কোটি ডলারের মালিক। আমি একে ভয় পেতে যাব কেন? আমি এবারেও স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন করলাম–কিছু কিনারা করতে পারলেন নাকি? কি করে দুর্ঘটনাটা ঘটল?

শান্তস্বরে মিঃ লেগো বললেন–গাড়ির সামনের চাকাটা ফেটে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল–আচ্ছা, মিঃ উইন্টার্স?

রাত নটা থেকে দশটার সময় আপনি কোথায় ছিলেন? কি করছিলেন?

আমি চটপট তাকে জানালাম–আমি এই ঘরেই ছিলাম। কয়েকটা চিঠির ডিকটেশান দিচ্ছিলাম।

পাল্টা প্রশ্ন ডিকটেশান কি রেকর্ডে টেপ করছিলেন?

আমি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলেই জিজ্ঞাসা করলাম–এর সঙ্গে দুর্ঘটনার কি সম্পর্ক আছে?

মিঃ লেগো কঠোর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল–এটা মোটেও দুর্ঘটনা নয়।

আমার রক্ত যেন তীব্র বেগে শিরা উপশিরা দিয়ে দৌড়তে আরম্ভ করল। বুকের মধ্যে ধক ধক করতে শুরু করল

আপনি কি বলছেন? এটা দুর্ঘটনা নয় তো কি?

খুন। পরিকল্পিত খুন।

দড়াম দড়াম করে হাতুড়ি

১৫.

কথাটা আমার মাথার মধ্যে যেন দড়াম দড়াম করে হাতুড়ি দিয়ে পিটছে। নিজেকে স্বাভাবিক রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে জিজ্ঞাসা করলাম–কি বলছেন? স্পষ্ট করে বলুন!

মানে এটাই, ভেস্তালকে খুন করা হয়েছে।দৃঢ়স্বরে মিঃ লেগো জানাল।

আপনি কিভাবে নিশ্চিত হলেন? জানতে চাইলাম। সে কথা পরে হবে, তার আগে আপনার ডিকটেশান টেপ করা ক্যাসেট দিন। ওটা সাক্ষী হিসাবে আমার একান্ত দরকার।

আমি মৃদু হেসে বললাম–সরি মিঃ লেগো, অনেক গুলো ব্যবসা সংক্রান্ত চিঠি এতে রেকর্ড করা আছে। সেগুলো এখনও টাইপ করা হয় নি। অবশ্য একান্ত দরকার পড়লে আপনি নিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু ভেস্তালের মৃত্যুর ব্যাপারে আপনি নিশ্চয়ই আমাকে দায়ী করছেন না?

প্রথম সন্দেহ স্বামীর উপরই এসে পড়ে, মৃদু হেসে মিঃ লেগো টেপটা বার করে তার উপর সই করে দিতে বলল।

তারপর মিঃ লেগো আমাকে জানাল যে, সে জানে অর্গিস আমাকে রাত নটা থেকে দশটার মধ্যে এই ঘরে দেখেছে। তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক যদিও ভাল নয়।

তবুও অর্গিস সত্যি কথা বলছে এটা ভেবেই তিনি সরাসরি আমাকে দায়ী করতে পারছেন না।

আমি এবার চালাকি করে জিজ্ঞাসা করলাম, তা আপনি কি বলেন?

লেগোর চোখ দুটো থেকে যেন আগুন ঝরে পড়তে থাকে। কঠোর দৃষ্টিতে সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল–তুমি টাকার লোভে তোমার স্ত্রীকে খুন করেছ।

আমার শরীর যেন অবশ হয়ে গেল। মৃত্যু যেন আমার গলা টিপে ধরবে এখনি। ফ্যাসফেসে গলায় বললাম, আমি ভেস্তালকে খুন করি নি।

হা তুমিই খুন করেছ। মিঃ লেগোর গলার স্বরে হুঙ্কার। রুক্ষ্ম স্বরে বলল–তোমাকে আমি খুব ভাল করে চিনি। মেয়েদের পটাতে তুমি পটু। আমি জানতাম তোমার সঙ্গে যখন ভেস্তালের পরিচয় হয়েছে, তখনই ওর বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। তুমি শেলীকে বিয়ে করনি,করেছ ওর টাকাকে।

আমি বাকরুদ্ধ হয়ে তার কথা শুনছি। একটু থেমে সে বলল–তুমি খুন করেছ, এ আমি নিশ্চিত। কিন্তু কি করে করলে বলতো?

ওর শেষ কথাটাতেই আমি মনে জোর ফিরে পেলাম। ভাবলাম, ও আমাকে ঘাবড়ে দিয়ে আসল সত্য জানতে চাইছে। আমিও সংযত থাকবার চেষ্টা করে বললাম–আমি যে খুন করেছি, তা প্রমাণ করুন আগে।

লেগো বিদ্রুপের স্বরে বলল–মিঃ উইন্টার্স, তুমি খুব বুদ্ধিমান। ভেস্তালকে তুমি খুন করেছ। তোমাকে আমি বঁড়শি দিয়ে গেঁথে তুলব। ভেঙালের খুনী কে আমি বার করবই।

তুমি উন্মাদ হয়ে গেছ–আমি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দিলাম।

তোমার গায়ে এখনই হাত তুলতে পারছি না আমি। কিন্তু শয়তানরা ভুল একটু অন্ততঃ করে থাকবে। তুমিও ইতিমধ্যে একটা বড় ধরনের ভুল করেছ।

মুহূর্তে আমার গায়ের রক্ত জল হয়ে গেল। হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

সে বলতে থাকে–গাড়িটার সামনের ফাটা চাকাতে বালি ছিল। কিন্তু গাড়িটা যে রাস্তা ধরে গেছে, সেখানে বিন্দুমাত্র বালি ছিল না। আর ক্লিক রোডেও বালি নেই।

আমি বাজি লড়ে বলতে পারি যে, কদিন আগে যে টায়ার ফেটেছিল, তুমি সেটাই লাগিয়েছ। তখন লক্ষ্য করে দেখোনি টিউবে বালি লেগেছিল। এভাবে ধর্মের কল বাতাসেনড়ে, তদন্ত করতে গিয়ে দেখা গেছে চাকাটার একটা নাট নেই। ক্লিক রোডে সেই চাকাটার একটা নাট পড়েছিল। এবার কি মনে হচ্ছে?

লেগোর কাহিনী শুনতে শুনতে আমি ভিতর থেকে দুমড়ে যাচ্ছি। লোকটা এখনই বোধহয় সব প্রমাণ করে দিল। তবুও বাইরে থেকে যতদূর সম্ভব নিজেকে শক্ত রাখার চেষ্টা করে দাপটের সঙ্গে বললাম–বেশ, লেফটেন্যান্ট তোমার কাল্পনিক গল্পটা প্রমাণ করে দেখাও।

লেগো আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জবাব দিল–মিঃ উইন্টার্স, আমাকে তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না। প্রমাণ আমি করব, তবে আমার ধারণা তোমাকে এ কাজে কেউ সাহায্য করেছিল, সে কে? তুমি একই সঙ্গে দু জায়গায় রইলে কি করে সেটাই গোলমেলে।

একটু থেমে আমার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল–তবে কি ইভ ডোলান তোমাকে এ কাজে সাহায্য করেছে?

আমার শরীর ঘামে ভিজে যাচ্ছে। আমি কায়দা করে বললাম–ও করতে যাবে কেন? আমরা কেউই এ কাজ করি নি। আসলে তোমার মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে।

আমার কথাগুলো একবার প্রতিধ্বনিত করল লেগো–ও কেন করতে যাবে? তারপর ব্যঙ্গের সঙ্গে বলল–আচ্ছা মিঃ উইন্টার্স,তুমি কি তোমার স্ত্রীর উইলের সম্পর্কে কিছু জান?

আমি ঘাড় নেড়ে জবাব দিলাম–না।

আমি প্রশ্ন করলাম–উইলের সঙ্গে দুর্ঘটনার কি সম্পর্ক থাকতে পারে?

লেগো বিদ্রুপের হাসি হেসে বলল মিস ডোলান বেশ বড় রকমের দাও মেরেছে ভেস্তালের কাছ থেকে, আর তাই তাকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে দিল।

আমি বললাম–তার মানে?

মানেটা এইরকম। ভেন্তাল নতুন উইল করে মিস ডোেলানকে তিন কোটি ডলার আর এই বাড়িটা দিয়ে গেছে। আর তোমাকে টাকা দিতে চাইলে নাকি তুমি নিতে চাইতে না। তাই তোমার ভাগে পড়েছে মাত্র তিরিশ হাজার ডলার।

তার কাছ থেকে এ কথা শোনার পর মনে হল যেন আমার পায়ের তলায়–মাটি নেই। আমার মুখের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করে লেগো কথাটা আবার বলল, অনেকটা যেন চিবিয়ে চিবিয়ে হ্যাঁ, মাত্র ত্রিশ হাজার ডলার পেয়েছ তুমি।

আমি জোর গলায় বললাম–তুমি আমাকে মিথ্যা কথা বলে বোকা বানাবার চেষ্টা করো না।

লেফটেন্যান্ট আমার মুখের অবস্থা দেখে হেসে ফেলল,আমি একটুও মিথ্যে বলছি না, তোমার স্ত্রীর উইল আমি নিজের চোখে দেখেছি।

আমি মুখের ভাব নির্বিকার রেখে হেসে বললাম–মিস ডোলান যদি অতটাকা পেয়ে থাকেন, তা তার সৌভাগ্যের কথা। আমার পক্ষে ত্রিশ হাজারই যথেষ্ট। তোমার যেমন খুশী, তেমনই ব্যাখ্যা কর।

আমার মনের ভিতরটা জ্বলে যেতে থাকে। ইভের এইজন্যই এত দর্প। ল্যারীর সঙ্গে পরামর্শ করেই সে আমাকে দিয়ে খুনটা করিয়েছে। আমার সঙ্গে ও এতবড় বেইমানী করল! ওকে এত সহজে আমি ছাড়ব না।

লেগো এবার দৃঢ়স্বরে প্রশ্ন করল–এবার বল, তোমার দলে মিস ডোলান ছিল কিনা? বল, দুজনে জুটি করে একাজটা করোনি? বল উইন্টার্স? সত্যি কথা বল!

আমিও হার মানবার পাত্র নই। মুখে হাসি এনে বললাম–তোমার স্বপ্ন, মিঃ লেগো তুমি নিজেই বারেবারে উপভোগ কর। বলছি তোআমি খুন করি নি। সারা সন্ধ্যা আমি এখানে কাটিয়েছি। অর্গিস আর ব্ল্যাকস্টেন সাক্ষী আছে।

দেখ উইন্টার্স চালাকি করবার চেষ্টা করো না। তোমরা দুজনে মিলে অর্গিস আর ব্ল্যাকস্টেনকে বোকা বানিয়েছ। মনে রেখ, ফাঁসির দড়ি তোমার গলাতেই নাচছে। তোমাকে এত সহজে আমি ছাড়ব না।কথাটা শেষ করে ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল লেগো।

আমি জানলার কাছে এসে দাঁড়ালাম। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমার হাত পা কাঁপছে। মুখে ঘাম ভর্তি হয়ে রয়েছে।

এক পেগ হুইস্কি খেয়ে ইডেন এন্ডে চলে এলাম। একটা নিরিবিলি টেবিলে বসে আগাগোড়া ব্যাপারটা ভাবতে লাগলাম। একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলাম।না, কোন ভুল আমার হয় নি। অর্গিস আর ব্ল্যাকস্টে যখন বলবে আমি বাড়িতে ছিলাম, তখন লেগো বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারবে না। জজসাহেব কেস বাতিল করে দেবে।

এবার আমাকে দেখতে হবে ডোলান কি বলে। খুন করবার আগে বলেছে–আমি তোমায় ভালবাসি। তোমাকে বিয়ে করব। আর কাজ হয়ে যাবার পরে বলছে, তুমি আমার ধারে

কাছে আসবে না। আমাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়ে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

আমার মনে হল ইভ দু-একদিনের মধ্যে পালাবে। তার আগে ওর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে দিতে হবে। নজর রাখতে হবে ওর গতিবিধির উপর। কিন্তু কি করে পাব ওর খবর? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ জোসুয়া মরগ্যানের কথা মনে হল।

সোজা রুজভেল্ট বুলেভার্ডে চলে এলাম জোসুয়ার অফিসে। লোকটির বয়স বছর পঞ্চাশ হবে, নজর দারিতে ওস্তাদ। এ কাজের জন্য ওর অনেক লোক আছে। এক হাজার ডলার দেব বললাম। সব বুঝিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফিরে এলাম।

বাড়িতে ফিরে প্রথমে অর্গিসের সঙ্গে দেখা হল। ভেস্তাল মারা যাবার পর থেকে সে যেন আমাকে এড়িয়ে চলছিল।

সে আমার কাছে মাইনে চাইল। বাড়ির সকল চাকরবাকর–প্রত্যেকেই নাকি বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চাইছে।

আমি তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললাম।–ঠিক আছে, পনের মিনিট পরে আমার ঘরে সবাইকে আসতে বলবে।

সকলে চলে যাচ্ছে শুনে আমার মনটা আনন্দে নেচে উঠল। ইভকে কিছুটা শিক্ষা দিতে পারব। একা এই বাড়িতে আমি আর ইভ। তার কাছ থেকেই জানতে পারলাম–মিস ডোলান বেরিয়েছে ছটার পর ফিরবে।

চাকর-বাকরের সংখ্যা তিরিশ জনা মতন হবে। যে যার বেতন নিয়ে চলে গেল। আমি তাদের সবার ঠিকানা নিয়ে নিলাম, যদি লেগোর কোন দরকার হয়।

সবার শেষে অর্গিস এল, টাকাটা হাতে নিয়ে ক্রুদ্ধ স্বরে বলল-ম্যাডামকে, আপনি যেভাবে মারলেন, তার দাম আপনাকে একদিন দিতে হবে স্যার।

আমি রেগে গিয়ে মেজাজের সুরে বললাম-এই বুড়ো উল্লুক, ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দেবার আগে, মুখ বুজিয়ে পালা। যা ভাগ।

আমার ধমক খেয়ে অর্গিস মাথা নীচু করে বেরিয়ে গেল।

বাড়িতে কেউ নেই। বিশাল বাড়িটা যেন মরে গেল। ঘড়ির টিকটিক শব্দ, আর বুকের ধক ধক শব্দ ছাড়া কোন কিছু শোনা যাচ্ছে না এতবড় বাড়িটা থেকে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম-পাঁচটা বেজে চল্লিশ মিনিট।

জানলার পাশে গিয়ে শূন্য মন নিয়ে বসেনীচের লম্বা তকতকে সিঁড়িটার দিকে চেয়ে রইলাম।

ইভ এখনি আসবে। আর তার সঙ্গে হবে আমার শেষ বোঝাপড়া।

.

১৬.

ছটার সময় নয়,কাঁটায় কাঁটায় নটার সময় বাড়ি ঢুকলইভ। এতক্ষণ আমি কেবলি ভেবে গেছি ইভের বিশ্বাসঘাতকতার কথা। সে ভেস্তালকে সহ্য করতে পারত না বলেই ঔষধ খাইয়ে অসুস্থ করে দিত। আসলে আমি ভেস্তালকে বিয়ে করবার পর ভেবে নিয়েছিল আমাকে দিয়ে সে তার ইচ্ছাটা পূর্ণ করাবে। আর এতদিন তাই সে আমার সঙ্গে অভিনয় করে নিজের কাজটা হাসিল করে নিয়েছে। আর এখন বেঁকে বসেছে। দেখা যাক বুদ্ধির দৌড় কার কতটা?

ইভ গ্যারেজে গাড়ি রেখে সদর দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি নিঃশব্দে লাউঞ্জে চলে এসে একটা সীটের পেছনে লুকিয়ে পড়লাম।

ইভ সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় চারিদিক তাকাল। ও ঘরে বাঁদিকে চলে যেতেই আমি হলের দরজায় চাবি দিলাম। কান খাড়া রাখলাম।

নিজের ঘরে ঢুকে ও ঘণ্টা বাজাল।বুঝতে পারলাম এখন ও এবাড়ির মালিক!তাই ঘণ্টা বাজিয়ে সে ঝি-চাকরদের ডাকল।

আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটা অব্যবহার্য ঘরে ঢুকে অপেক্ষা করছি।

বার বার ঘণ্টা বাজানোর পরে সে ইন্টারন্যাল ফোন তুলে ডায়াল করল ও পাশে ক্রিং ক্রিং শব্দ শোনা গেল।

এবার সে বিরক্তির সঙ্গে সিঁড়ির থামটার পাশে এসে দাঁড়াল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে হলের ঠিক মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। ডাক দিল–অর্গিস! কেউ সাড়া দিল না।

ওর মুখটা তখন বেশ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ও অস্থির হয়ে উঠছে। একটা ভয় ক্রমশঃ গ্রাস করছে ওকে। তার এরকম পরিণতি দেখে আমার খুব আনন্দ হচ্ছিল।

ইভ হঠাৎই চেঁচিয়ে উঠল–এখানে কে আছ? অর্গিস তুমি–তোমরা কোথায় গেলে? সাড়া দিচ্ছ না কেন?

নিস্তব্ধ সব।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর নিজের মনে বলল–সকলেই তাহলে কি একসঙ্গে চলে গেল! না, তা তো হতে পারে না। ভয় পেয়ে গেল ইভ।

দৌড়ে গিয়ে হলের দরজাটা একটানে খোলবার চেষ্টা করল। একটুও নড়ল না দরজাটা।

ইতিমধ্যে আমি ইভের খানিকটা তফাতে এসে দাঁড়িয়েছি। কয়েক মুহূর্ত ওকে দেখলাম, তারপর হেসে বললাম–দরজাটা টানাটানি করে কোন লাভ নেই। ওটা চাবি দেওয়া।

আতঙ্কে সে প্রায় চীৎকার করে ঘুরে দাঁড়াল আমার দিকে, তারপর দুহাত দিয়ে মুখটা ঢেকে ফেলল। বলল–তুমি ওরকম ভাবে আমাকে দেখছ কেন?

— তোমাকে অভিনন্দন জানাতে। বুকের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে তবুও হাসবার চেষ্টা করলাম–এরকম প্রাসাদতুল্য একটা বাড়ি,সঙ্গে তিন কোটি ডলার!কিরকম লাগছেবলতো ইভ?

মুখ থেকে হাত সরিয়ে বলল–আমাকে যদি কেউ ভালবেসে দান করে যায়, সেটা কি আমার দোষ?

আমি তার কথায় গুরুত্ব না দিয়ে বললাম তুমি আর ল্যারী দুজনে মিলে তো পরিকল্পনাটা বেশ করেছ। মিষ্টি কথায় বেশ কাজ হাসিল করে এখন আমাকে কাঁচকলা দেখাচ্ছে। এটা কিন্তু খুব গুণের কথা? এখন তুমি খুব খুশী তো?

ইভ তাচ্ছিল্যের স্বরে জবাব দিল–পরিকল্পনাটা তোমারই ছিল আর যা করেছ তুমিই করেছ। –মিঃ উইন্টার্স! তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না, আমি এখনি সব গোছগাছ করে নিয়ে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।

আমি তার কথা উড়িয়ে দিয়ে বললাম–লেফটেন্যান্ট লেগো জেনে গেছে যে, আমরা দুজনে মিলে এই কাজটা করেছি।

সঙ্গে সঙ্গে ইভের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল ভয়ে। চীৎকার করে উঠলতুমি আমাকে মিথ্যা কথা বলছ।

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তাই হোক কিন্তু লেগো ভীষণ চতুর। ফেটে যাওয়া চাকার মধ্যে তিনি বালি আবিষ্কার করেছেন, একটা হারিয়ে যাওয়া নাটক্লিক রোডে পেয়েছেন।

তিনি সরাসরি আমাকে প্রশ্ন করেছেন–ভেস্তালকে খুন করবার আসল পরিকল্পনাটা তোমার কিনা? কারণ তার ধারণা উইলের জন্যই তুমি খুন করেছ।

ইভ আঁতকে উঠে দু–পা পিছিয়ে গেল।তুমি, তুমি মিথ্যা বলছ।

আমি হেসে বললাম, বিশ্বাস করতে হবে না। কিন্তু মিঃ লেগো যখন প্রমাণসহ হাজির হবে, তখন সামাল দিও। তোমার ল্যারী তখন তোমার কাছে থাকবে তো? বলতে বলতে ধীর পায়ে আমি ইভের দিকে এগিয়ে গেলাম।

ইভ দুপা পিছিয়ে গিয়ে সভয়ে বলে উঠল–খবরদার আমার দিকে এগোবে না।

আমি গর্জন করে বলে উঠলাম–দাঁড়াও, তোমার এই ব্যবহারের মাসুল দিতেই হবে। একটা কাজ করলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

তোমার নরম সরু গলাটা আমার এই লৌহকঠিন হাত দিয়ে শুধুমাত্র একটু চাপ দেব। তারপর তুমি কেবল একটা লাশে পরিণত হবে। তুমি যাতে আর অন্য কোন পুরুষকে ধোকা না দিতে পার, সেজন্য এটুকু তো আমায় করতেই হবে।

আচমকা ইভ একটা লাফ দিয়ে দু–হাতে আমার বুকে ধাক্কা মেরে দুমদাম করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল।

একটু বেসামাল হয়ে গিয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি ওর পিছনে ছুটলাম।

ভেস্তালের পড়ার ঘরে বড় ডেস্কটার একপাশে ইভ আর এক পাশে আমি।

ইভ গর্জন করে উঠল–আমার কাছে আসবার চেষ্টা করবে না।

আমি হেসে বললাম–তোমাকে একটু আদর করব। বলে ধীরে ধীরে তার দিকে এগোলাম।

চট করে ড্রয়ারের ভেতর থেকে ৩৮ বোরের একটা পিস্তল বার করে আমার বুক লক্ষ্য করে তাক করল। আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

এসো। আদর করবে এস–বিদ্রুপের সুরে বলল ইভ।

–তোমাকে আমি বোকা বানিয়েছি, ধাপ্পা দিয়েছি শে। আমি শুধুমাত্র তোমাকে দিয়ে ভেস্তালকে খুন করাবার মতলবে ছিলাম।

তোমার সঙ্গে যখন শুয়েছি, প্রতিটি মুহূর্ত তোমাকে ঘেন্না করেছি। সব মুখ বুজে সহ্য করে গেছি। দামও দিতে হয়েছে তার জন্য। এখন আমি সব পেয়ে গেছি। এবার তুমি এখনি এ বাড়ি থেকে বেরোও।

আমি অবস্থা ভাল নয় বুঝে, পিছু হটলাম।তাকে শাসালাম–তোমার সুখের জীবন আমি ভেঙ্গে তছনছ করে দেব।

ইভও ভয় না পেয়ে জবাব দিল–তুমি এখান থেকে না গেলে এখনি গুলি চালাব।

আমি মৃদু হেসে বললাম–শুভরাত্রি ইভ। সারারাত ধরে একা এই বাড়িতে ভেস্তালের প্রেতাত্মার সঙ্গে আলাপ কর।

.

জ্যাকের বারে চলে এলাম। রাত বেশ অনেক হয়েছে। তিন পেগ হুইস্কি শেষ করে চতুর্থটার জন্য কাউন্টারের দিকে এগোচ্ছি, এমন সময় কে যেন আমার নাম ধরে ডাকল।

শেড ডার্লিং! চমকে পিছন ফিরে তাকালাম পাশের দিকে। তার দিকে তাকাতে অনেক পুরান স্মৃতি মনে এল।

ছবির মত অনেকগুলো দৃশ্য, অনেক কথা মনে পড়ে গেল। ভেস্তালের আগে সে ছিল আমার সাথী, ভেস্তালের সঙ্গে বিয়ের আগের রাতও যার সান্নিধ্যে কাটিয়েছিলাম, সেই গ্লোরির দেখা পেলাম আজ কতদিন পরে।

প্রায় সোল মাস আমি তার কোন খবর রাখি নি।

তাকে জিজ্ঞাসা করলাম–গ্লোরি, কি খবর তোমার, কেমন আছ?

সে আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বলল–মনে হচ্ছে খুশী হও নি তুমি?

আমি বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে আনন্দের সঙ্গে বললাম আমি একশবার খুশী হয়েছি। তা তুমি। এখানে কেন?

গ্লোরি মুচকি হেসে জানাল–আমি ভেবেছিলাম কোন রাজকুমার আমাকে ডেকে নিতে আসবে। কিন্তু কেউ এল না, বোধহয় আর আসবেও না–তার গলায় শ্লেষের সুর।

আমি ওর গালে টোকা মেরে আদুরে সুরে বললাম–কে বলল, আসবে না? এই তো আমি এসেছি। চল, আমরা কোন নিরাপদ আশ্রয়ে যাই।

গ্লোরি আমার কথা শুনে খুব খুশী হল।বলল–আমার ফ্ল্যাটে চল। তোমার তো গাড়ি আছে?

গাড়ি চালাতে চালাতে বললাম–তোমাকে খুব মিস করেছি। গ্লোরি–এখন কি করছ?

না, কিছু না। গ্লোরি হেসে বলল–তোমরা যখন ভেনিসে হনিমুন করছিলে, আমি তখন ফ্লোরিডাতে একজন সুন্দর বৃদ্ধের সঙ্গে দিনগুলো কাটাচ্ছিলাম। বেশ ভালই কাটছিল,হঠাৎ কোথা থেকে বুড়োর স্ত্রী এসে তাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

একসময়ে সে আঙুল দিয়ে স্থান নির্দেশ করে বলল বাঁ দিকে ঘোরাও। ব্যাস এখানেই গাড়ি থামাও। আমি এখানে নামছি। তুমি পিছন দিকে গাড়িটা পার্ক করো।

আমি লিফটে করে সোজা চলে গেলাম গ্লোরির ফ্ল্যাটে।

গ্লোরি আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল। ঘরটা বেশ ছোট কিন্তু সাজানো গোছান। গ্লোরির ঠোঁটে মৃদু হাসি তাকে বেশ মোহময়ী করে তুলেছে। বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে গ্লোরিকে।

আমি আসবার আগেই ও নিজেকে অন্য পোষাকে আচ্ছাদিত করে নিয়েছিল। হলদে সিল্কের গাউনে বেশ ভালই লাগছে।

আমি তার কাছে এগিয়ে এসে দুহাত দিয়ে গ্লোরির কোমরটা বেড় দিয়ে ধরে আমার শরীরের সঙ্গে লাগিয়ে আলতো করে ওর ঠোঁটে চুমু দিলাম।বললাম তুমি জানো আমার স্ত্রী মারা গেছে?

হ্যাঁ, খবরের কাগজ থেকে জেনেছি।বলে গ্লোরি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল–তাহলে তোমার স্ত্রীর টাকার মালিক তো এখন তুমি?

সবটা নয়, ডার্লিং। বেশীর ভাগটা গেছে অন্যের দখলে। যা এখন বাদ দাও এসব কথা। তার চেয়ে বরং আমরা মহৎ কাজে লিপ্ত হই, এস।

পরদিন ব্রেকফ্রাস্টের সময় গ্লোরিকে বেশ বয়স্ক দেখাচ্ছিল। ও যা উচ্ছৃঙ্খল জীবন–যাপন করছিল, তাতে অকালে বুড়ি হওয়া তো স্বাভাবিক।

গ্লোরি জিজ্ঞাসা করল–এতদিন কোন্ রূপসীর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলে? শেড ডার্লিং! আমি তো বাপু সতীপনা করি না, তা তো তুমি জান?

আমি হেসে বললাম–হা ভেস্তালের সেক্রেটারী। কটা মাস ওর সঙ্গ পেয়ে কামোত্তেজনা মেটাবার চেষ্টায় ছিলাম। কিন্তু এখন যদিও আর কোন সম্পর্ক নেই।

গ্লোরি বলল–একসময় তুমি মেয়েগুলোকে নাচাতে, আর এই প্রথম তুমি একটা মেয়ের কাছে হেরে গেলে তাই তো?–তার কথায় ব্যঙ্গের সুর।

আমার মুখে শুকনো হাসি–তুমি দেখছি জ্যোতিষি হয়ে উঠেছে।

শেড, আমি নিজেও পুরুষদের কাছ থেকে তাক বুঝে পালাতে অভ্যস্ত ছিলাম, এখন তারা আগে পালিয়ে যায়। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল–যৌবন তো যায়, সুন্দরীও নই আমি, তবুও তুমি আমার সঙ্গ পাবার জন্য উদগ্রীব।

জান শেড, গতরাতে তুমি ভীষণ নিষ্ঠুরের মত আমাকে পীড়ন করেছ। তোমার চাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিতে আমার দেহের আর ক্ষমতা ছিল না। মনটা যদিও তৃপ্ত হচ্ছিল। কিন্তু তুমি আমাকে কাল প্রায় মেরে ফেলছিলে।

আমি হাসলাম।

একটু থেমে সে আবার বলল–আচ্ছা, মেয়েটা কি খুব সুন্দরী, তবে ওর গলা শুনে মনে হল–কড়া ধাতের মেয়ে।

তার দ্বিতীয় কথাটায় আমি চমকে উঠলাম। ঘাড় ঘুরিয়ে গ্লোরির দিকে তাকালাম। তুমি ওর কথা শুনলে কখন?

গ্লোরি সরলভাবে উত্তর দিল–টেলিফোনে শুনেছি। মিয়ামী থেকে ফিরে মনে হল তোমার খোঁজ খবর নেওয়া দরকার।

আমার ভ্রূ দুটো কুঁচকে গেল। ইভ তো আমাকে কিছু বলেনি। চীৎকার করে বললাম তুমি কখন ফোন করেছিলে?

পরশু ফোন করেছিলাম। তখন রাত নটা কুড়ি হবে। মেয়েটি ফোন ধরেছিল। তুমি বাইরে গেছ জানিয়ে সে ফোনটা নামিয়ে রাখল। অথচ আমি তোমার গলা

ওর কথা শেষ হতে না হতেই এক লাফে গিয়ে ওকে খামচে ধরলাম। আমার কোন কথা তখন তুমি শুনতে পেয়েছিলে?

দুঃখিত শেড। কথাটা তোমাকে এতটা বিচলিত করবে ভাবিনি। সেভয় পেয়ে বলল–শেড লাগছে আমায় ছাড়।

আমি চেঁচিয়ে বলে উঠলাম–চোপরাও। টেলিফোনে তুমি কি শুনেছিলে বল?

ও তোতলাতে তোতলাতে বলল–তুমি চিঠি ডিকটেটকরছিলে। কোনওয়ে সিমেন্ট–এরকম জাতীয় ব্যবসার কোন বিষয়ে। আর উত্তর দেবার সময় ঐ মেয়েটির গলা বেশ দৃঢ় অথচ বিচলিত শোনাচ্ছিল।

ওকে আমি ছেড়ে দিলাম। হাত–পা ঠাণ্ডা, অবশ হয়ে যাচ্ছে। কঁপছিল আমার সারা শরীর। গ্লোরি আবার বলল–শেড কি হল তোমার? আমি কোন অপরাধ করে ফেলেছি? রাগের চোটে আমার মুখের ভাষা নোংরা হয়ে গেল।কি করেছিস হারামজাদি? সেই সময় ভেস্তাল আমার হাতে খুন হচ্ছে। দাঁত কড়মড় করে গ্লোরির হতভম্ব মুখের মধ্যে এক ঘুষি লাগালাম। অতর্কিত আক্রমণে গ্লোরি মেঝেতে ছিটকে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে আমি ঝড়ের বেগে সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচে চলে এলাম।

.

১৭.

রুজভেল্ট বুলেভার্ড জন সমাগমে মুখরিত। ভীড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে আমি একটা বুথ থেকে জোসুয়া মরগ্যানকে ফোন করলাম। তখন সকাল সাড়ে নটা হবে।

জোসুয়া মরগ্যান জানাল–মিস ইভ এখন পামবীচ হোটেলের একশ ঊনষাট নম্বর ঘরে রয়েছে। আপনি চলে যাবার পরই ও এখানে চলে আসে সঙ্গে বেশ বড় একটা সুটকেসও রয়েছে।

আমি মরগ্যানকে বললাম–আরো খবর নিতে।

এবার আমি ফোন রেখে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে এলাম পামবীচ হোটেলে। দরজায় টোকা দিতেই বাজখাই গলায় প্রশ্ন এল–কে?

প্রত্যুত্তরে গম্ভীর গলায় বললাম– টেলিগ্রাম। মিস।

সে দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে আলতো ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

আমাকে দেখে ইভ সভয়ে পিছিয়ে গেল, ভয়ে মুখখানা শক্ত কাঠ।

আমি মৃদু হেসে বললাম তোমার বোকামীর জন্য আসতে হল।

অবাক হয়ে ইভ তাকিয়ে রইল।

তুমি আমাকে বলল নি কেন যে আমার ফোন এসেছিল সেই রাতে?

তোতলাতে তোতলাতে ইভ বলল–আ–আ–আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

কি বোকামীর কাজ করেছিলে তুমি? ব্ল্যাকস্টে আর অর্গিস দুজনে নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছিল টেলিফোনের রিং আর তোমার উত্তর?

–তাতে কি হয়েছে? সকলেই জানে যে তুমি ব্যস্ত ছিলে আর তোমাকে বিরক্ত না করে কেউ, সেজন্যই বলেছি বাইরে গেছ।

তার কথা শুনে মনে হল যেন একটা ঘুষি মেরে মুখটা ফাটিয়ে দিই। নিজেকে সংযত করে নিয়ে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম–সকলে জানে যে আমার চিঠির ডিকটেশান গুলো ঐ মুহূর্তে টেপ হচ্ছিল, সবাই টেলিফোনের কথা শুনেছে, তাহলে তোমার টেলিফোনের কথা বলাটা নিশ্চয়ই টেপ হয়ে থাকবে। কিন্তু মিঃ লেগো টেপ শুনে দেখবে তোমার গলাটা রেকর্ড হয়নি। তখন সবাই এটা বুঝতে পারবে, রেকর্ডটা পূর্বে করা হয়েছে ও খুনটাও পূর্ব পরিকল্পিত।

ব্যাপারটা বুঝে ইভ বেশ ভয় পেয়ে গেল। সে কাঁপা কাঁপা স্বরে বলল–তাহলে এখন কি হবে?

সময় মতো যদি আমাকে বলতে, কিছু অন্ততঃ একটা ব্যবস্থা করতাম–একটু থেমে থেমে আবার বললাম–আমাদের এখান থেকে পালাতে হবে। এছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

কিন্তু পালিয়ে তুমি যাবে কোথায়। পুলিশ তো অপরাধীদের খুঁজে বার করে ঠিক।

আমি তোমাকে নিয়ে যেখানে যাব, সেখানে পুলিশ আমাদের হদিশ খুঁজে পাবে না। কিন্তু আমি জানতে চাই–তুমি কি যাবে আমার

হ্যাঁ, আমি তোমার সঙ্গে যাব। ইভের চোখদুটো সাদা কাগজের মত লাগছিল।

আমি তাকে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে এসে নিয়ে যাব বলে চলে গেলাম।

ফিরে এসে দেখলাম পাখী পালিয়েছে। যদিও আমার একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল, অবিশ্যি সামান্য। রাগে শরীরটা দাউ দাউ করে জ্বলছে।

ফোনে জোসুয়া মরগ্যানের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে পারলাম–আমার চলে যাবার পর ইভ–ল্যারী গ্রাঞ্জারকে ফোন করেছিল আর আজ দুপুর আড়াইটার সময় সমুদ্রের বাইরের কুঁড়ে ঘরে দুজনে দেখা করবে।

আমি মরগ্যানকে ওর লোজন তুলে নিতে বললাম। পারিশ্রমিকের জন্যে আমার সঙ্গে বাড়িতে যোগাযোগ করতে বললাম।

এখন বাজে সাড়ে বারোটা। আমার করণীয় কাজগুলো পর পর সাজিয়ে নিলাম।

প্রথমে আটলান্টিক হোটেলে কানেকশান চাইলাম হ্যালো, আটলান্টিক? শুনুন, মিঃ। গ্যাঞ্জারকে একটা খবর দিতে হবে

কি?

উনি এইমাত্র বেরিয়েছেন। ঠিক আছে, খবরটা লিখে নিন। উনি এলে দয়া করে জানিয়ে দেবেন।

–হ্যাঁ।

লিখে নিন–ল্যারী গ্রাঞ্জার, দেরী হয়ে গেছে, সাড়ে পাঁচটার আগে দেখা করতে যেও না–ইভ।

আচ্ছা, ধন্যবাদ।

.

১৮.

মিঃ অ্যাটর্নী, এই পর্যন্ত শুনে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন আমি কেন আমার স্ত্রীকে খুন করলাম। আসলে, কেবলমাত্র টাকার জন্যে নয়, ইভকে পাবার জন্য আমি একাজ

করলাম। ইভের প্রেম এজন্য দায়ী। বেশ বুদ্ধি করে খুনের মতলবটা ইভ আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে আমাকে এ কাজে প্ররোচিত করেছে। সুতরাং ইভ হল আসল খুনী।

ইভ ভীষণ চালাক আর নোংরা মেয়ে। আমি কুঁড়ে ঘরটাতে পৌঁছোলাম, দেখলাম–ইভ ল্যারীর অপেক্ষায় তৈরী হয়েই আছে।

ইভ আমাকে দেখতে পেয়েই নাগিনীর মত ফুঁসে উঠল তবুও হাসবার চেষ্টা করে বললাম–হ্যালো ইভ। দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। আমাদের পালাবার পথ বন্ধ।

ইভ ৩৮ বোরের রিভলভারটা আমার দিকে তাক করে বলল তুমি পারবে না ঠিকই, কিন্তু আমি পালাতে পারব।

আমি তার দিকে এগোতেই সে বলল–এগিও না, তাহলে গুলি করব। আমি জানতাম যে, স্যারীর দেখা পেলে সে আমাকে গুলি করে মারবে।

আমিও মনে মনে ফন্দি আঁটছিলাম। ইভ আমার কাছ থেকে ষোল সতের ফুট দূরে। এখান থেকেঝাঁপিয়ে পড়লে ওকে আঘাত করা যাবেনা। ভেতরে ভেতরে ও অস্থির হয়ে উঠছিল ল্যারীর জন্য। সুযোগটা কাজে লাগালাম।

কই, করো গুলি–বলে ইভের দিকে এগিয়ে যেতে থাকি। জানলার দিকে তাকিয়ে হেসে বললাম–ওই যে, তোমার প্রেমিক মহাশয় এসে পড়েছে।

ইভ যেই ঘাড় ঘুরিয়ে জানলার বাইরে তাকিয়েছে আমি বাঘের মত ওর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। রিভলভারটা ঘরের কোণে ছিটকে গেল। ওর গায়ে অসম্ভব শক্তি। ওর সুন্দর গলাটা চেপে ধরতে চাইলাম।

দুহাঁটু দিয়ে ওর হাত দুটো চেপে ধরে ওর বুকে বসে ওর গলাটা টিপে ধরলাম। কোটর থেকে চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ওর সর্বাঙ্গ শিথিল হয়ে গেল। ডান নাকের ফুটো দিয়ে বেরিয়ে এল একফোঁটা রক্ত। মুহূর্তের মধ্যে নিস্পন্দ, নিথর হয়ে দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

.

সমাপ্তির আগে

শেড দেখল দূরে ফোর্ড গাড়িটা আসছে। একসময় ঘরের কাছাকাছি এসে গাড়িটার ইঞ্জিন বন্ধ হল, এগিয়ে আসা পায়ের শব্দ পাচ্ছে ও। শেড রেঞ্জটাকে শক্ত হাতের মুঠোয় চেপে ধরল।

ল্যারী দরজা খুলে ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে শেড ভারী রেঞ্জটা দিয়ে আঘাত করল। মাথার ব্রহ্মতালুর উপর যেন আচমকা বজ্রপাত হল।

ল্যারী লুটিয়ে বসে পড়ল। কথা বলার শেষ চেষ্টাও তার হল না।

শেড তাকে পরীক্ষা করে বুঝল–একদম শেষ।

শেডের এদিককার কাজটা শেষ হল। ল্যারীর পকেট হাতড়ে গাড়ির লাইসেন্স, ন্যাতানোব্যাগ, সিগারেট কেস, রুমাল, দেশলাই আর বিশ ডলারের একটা নোট পেল। সেগুলো টেবিলের উপর রেখে ল্যারীর পোষাকগুলো সে পরে নিল আর তার পোষাকগুলো ল্যারীকে পরিয়ে দিয়ে সে টেবিলের উপর থেকে জিনিসগুলো হস্তগত করল।

পালাবার শেষ চেষ্টায় সে ল্যারীর মৃতদেহটা কাঁধে তুলে নিয়ে বুইক গাড়ির দরজা খুলে দেহটাকে শুইয়ে দিল পিছনের সীটে।কুঁড়েঘরে ফিরে গিয়ে টেপের চাকতি দুটো নিয়ে নিল।ইভের সটকেসের দিকে তার নজর পড়ল। খুলে তার মধ্যে দেখতে পেল ভেস্তলের গহনার বাক্স। সব শুদ্ধ নিয়ে গাড়িতে তুলল।

শেডের মুখে এবার বিজয়ীর কঠিন হাসি। সে ল্যারীর বুইকটা নিয়ে দ্রুতবেগে ধাবিত হল। হেডলাইটের বদলে ছোট লাইট দিয়েই সে রাস্তার অন্ধকার দূর করেছে।

আবার সেই ক্লিকরোড, সেই বেড়া। শেড বেড়ার কাছে এসে গাড়ি থামিয়ে নিজের স্যুটকেসটা, পার্সেল আর গয়নার বাক্সটা ঘাসের মধ্যে নামিয়ে আনল। এগুলো সবই জেলা অ্যাটর্নী জন হ্যারিন্টনের কাছে পাঠাতে হবে।

এবার সে বুইক গাড়িটাকে খাদের ধারে এনে ফাঁকের মুখে গাড়ির মুখটা ঘুরিয়ে রেখে নেমে এল।

গাড়ির ইঞ্জিন চালু রেখে গাড়ির দরজা খুলে হাত দিয়ে ক্লাচ পেডাল চেপে ধরল। গিয়ার পাল্টে তিনের ঘরে তুলে দিল। ইঞ্জিন পুরো গতি না নেওয়া পর্যন্ত সেনাকটা পুরো টেনে

রাখল। তারপর কটা লম্বা শ্বাস নিয়ে ক্লাচ্ ছেড়ে দিয়ে পিছন দিকে নিজের দেহটা সরিয়ে নিল।

একটা ভীষণ ঝাঁকুনি, তারপর গাড়িটা সামনের দিকে লাফিয়ে পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির খোলা দরজাটা ঘুরে এসে শেডের কাঁধে প্রচণ্ড জোরে আছড়ে পড়ল।

ধাক্কাতে ছিটকে দুপাক গড়িয়ে গেল শেড। আর গাড়িটা সাঁ–সাঁ করে তার পাশ দিয়ে যেন উড়তে উড়তে গভীর খাদে গড়িয়ে পড়ল।

মুহূর্তের মধ্যে গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেল। খাদের অতলে। আর তখনি হঠাৎ ভয়ঙ্কর আতঙ্কে তার শরীরটা হিম হয়ে গেল। সে যে নিজেই খাদের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। প্রাণের ভয়ে মরিয়া হয়ে সে ঘাস মাটিকেই মুঠো করে ধরল। মাটিতে আঙুল গুলো শক্ত করে গেঁথে দিল।

ওদিকে বুইকটা খাদের মধ্যে পড়ে প্রচণ্ড শব্দে আগুন ধরে গেল। তার ধাক্কায় পাথর গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। একটা অন্ধ, দুর্দমনীয় আতঙ্কে মরিয়া হয়ে সে অন্য কিছু ধরবার চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না। হাতের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ছে। দেহটা কতক্ষণ ধরে আর ঝুলে থাকবে! শেষ চেষ্টায় সেঝাঁকুনি দিয়ে দেহটা ওপরে তোলবার চেষ্টা করল। ডান হাঁটুটাও তুলতে পারল। কিন্তু তার হাতের চাপে মাটির চাবড়া আলগা হতে হতে শেষ পর্যন্ত খসে গেল। শেড হাত বাড়িয়ে আরেক জায়গা ধরবার চেষ্টা করল। কিন্তু সে সুযোগ পেল না। দেহটা অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর পথে পাড়ি দিল।